www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ "আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব নিয়ামত তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন মানুষের কল্পনায় উদয়ও হয় নাই।" ইহাতে আধ্যাত্মিক বেহেশত সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। মানবাত্মার একটি দ্বার আধ্যাত্মিক জগতের দিকে খোলা আছে। ইহার সাহায্যে এই আধ্যাত্মিক বেহেশতের রহস্য জানা যায়। আধ্যাত্মিক জগতের দিকে যাহার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক বেহেশত সম্বন্ধে তাহার কোন সংশয় থাকে না এবং তাহার মনে পরকালের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া থাকে। শুধু অপরের নিকট শুনিয়া মানিয়া লওয়াতে নহে বরং প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।

মানবাত্মার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের কারণ ঃ চিকিৎসক জানে, এই জগতে মানবদেহের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও পীড়া আছে। স্বাস্থ্য ও পীড়ার অনেক কারণ রহিয়াছে। ঔষধ সেবন ও কুপথ্য বর্জন স্বাস্থ্যের কারণ এবং অতিরিক্ত আহার ও কুপথ্য ভক্ষণ পীড়ার কারণ। তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জগতের দিকে যাহার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়াছে তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পান যে, মানবাত্মার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য আছে। মারিফাত ও ইবাদত আত্মার পীড়ার ঔষধ এবং সৌভাগ্য লাভের উপায়; অজ্ঞানতা ও পাপ আত্মার পক্ষে ধ্বংসকারী বিষয়স্বরূপ। এই সমস্ত জানা একটি বড় গৌরবের বিদ্যা। যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত এমন বহু বিদ্বান লোকও এই সকল বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। এমনকি কেহ কেহ উহা অস্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেবল দৈহিক বেহেশত-দোযখ মানেন এবং একমাত্র অপরের কথা শুনিয়া ও বিশ্বাস করিয়া আখিরাতের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। এই সকল বিষয়ের প্রকৃত অর্থ ও বিশদ ব্যাখ্যা আমি [অর্থাৎ হযরত ইমাম গাযালী (র) সাহেব] প্রমাণাদিসহ আরবী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যাহার বুদ্ধি আছে এবং যাহার হৃদয় অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ও অন্ধ বিশ্বাসের মলিনতা হইতে পবিত্র তাহার জন্য এ-স্থলে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট, সে পরকালের পথ পাইবে এবং তাহার অন্তরে পরকালের অবস্থা দৃঢ়রূপে প্রতিফলিত হইবে। পরকাল সম্বন্ধে অনেকের বিশ্বাস নিতান্ত দুর্বল ও নড়বড়ে (পরিবর্তনশীল)।

জীবাত্মা ও মানবাত্মা ঃ মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ ও অবস্থা জানিতে চাহিলে প্রথমেই মানিয়া লইতে হইবে যে, মানুষের দুই প্রকার আত্মা আছে। একটি সাধারণ জন্তুর আত্মার সমজাতীয়। ইহাকে জীবাত্মা বলে। অপরটি ফেরেশতাগণের আত্মার সমজাতীয়। ইহাকে মানবাত্মা বলে।

জীবাত্মার মূল উৎস বক্ষঃস্থলে বাম পার্শ্বে অবস্থিত হৃদপিণ্ড নামক গোশ্‌ত খণ্ড। ইহা প্রাণী-দেহের বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে উৎপন্ন অতি সূক্ষ্ম তেজসদৃশ বস্তু। ইহার প্রকৃতি নাতিশীতোষ্ণ। ইহার প্রভাব হৃদপিণ্ড হইতে প্রবহমান স্নায়ুপথে বাহির হইয়া মস্তিষ্কে ও অন্য সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করে। এই জীবাত্মা সংজ্ঞা ও চলার শক্তি প্রদান করে। ইহার প্রভাব মস্তিষ্কে উপস্থিত হইলে ইহার উষ্ণতা কমিয়া সমভাবাপন্ন হয়। ইহার প্রভাবেই চক্ষু দর্শন ক্ষমতা লাভ করে এবং কর্ণ শ্রবণশক্তি পাইয়া থাকে। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয় নিজ নিজ ক্ষমতা লাভ করে। জীবাত্মাকে প্রদীপের সহিত তুলনা করা চলে। প্রদীপ গৃহের অভ্যন্তরে যে-স্থানে স্থাপিত হয় ইহার আলোকে গৃহের প্রাচীরসমূহ আলোকিত হয়। প্রদীপের আলোক প্রাচীরে পতিত হইলে প্রাচীর যেমন আলোকিত হয় তদ্রূপ আল্লাহ্‌র কৌশল ক্রমে জীবাত্মার প্রভাব চক্ষে পতিত হইলে ইহা দর্শন ক্ষমতা লাভ করে; কর্ণে পতিত হইলে শ্রবণশক্তি পাইয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয় আপন আপন ক্ষমতা লাভ করে।

কোন স্নায়ুতে বন্ধন পড়িলে বন্ধনের পশ্চাতে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে তাহা অকর্মণ্য ও অবশ হইয়া যায়। ইহাতে তখন কোন সংজ্ঞা ও নড়াচড়ার শক্তি থাকে না। চিকিৎসক ঐ বন্ধন খুলিবার চেষ্টা করে। জীবাত্মা প্রদীপের শিখাস্বরূপ, হৃৎপিণ্ড শলিতা এবং পানাহার তৈল সদৃশ। প্রদীপে তৈল না দিলে যেমন প্রদীপ নিভিয়া যায় তদ্রূপ আহার না করিলে জীবাত্মার সাম্যভাব থাকে না এবং প্রাণ মরিয়া যায়। তৈল থাকিলেও তৈল টানিতে টানিতে শলিতা কিছুদিন পরে এমন অবস্থাপ্রাপ্ত হয় যে, আর তৈল টানিতে পারে না। সুতরাং প্রদীপ নিভিয়া যায়। তদ্রূপ বহুদিন পর হৃদপিণ্ডও এমন অবস্থাপ্রাপ্ত হয় যে, আর খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না। প্রদীপে আঘাত করিলে তৈল– শলিতা থাকা সত্ত্বেও প্রদীপ নিভিয়া যায়। সেইরূপ কোন প্রাণীকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেও ইহা মরিয়া যায়। যতদিন জীবাত্মার স্বভাব সমভাবাপন্ন থাকে ততদিন সে আল্লাহর আদেশক্রমে আকাশের ফেরেশতাগণের নূর হইতে এক প্রকার সূক্ষ্ম শক্তি প্রাপ্ত হইয়া বোধশক্তি ও গতিশক্তি গ্রহণ করে। কিন্তু উষ্ণতা বা শীতলতার আধিক্য অথবা অন্য কোন কারণে উহার সেই সাম্যভাব না থাকিলে জীবাত্মা আর ঐ শক্তি গ্রহণের উপযোগী থাকে না। দর্পণ যতক্ষণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে ততক্ষণ জড় পদার্থের ছবি গ্রহণ করে অর্থাৎ ইহাতে ছবি দেখা যায়, কিন্তু দর্পণ নষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন হইলে ইহার ছবি গ্রহণের ক্ষমতা আর থাকে না অর্থাৎ ইহাতে আর ছবি দৃষ্ট হয় না। ইহাতে ভাবিও না যে, জড় পদার্থের আকৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে ; বরং ইহার কারণ এই যে, দর্পণের আর প্রতিবিম্ব গ্রহণের ক্ষমতা নাই। এই প্রকার জীবাত্মাতে যতকাল শীতোষ্ণতার সাম্যভাব বিদ্যমান থাকে ততকাল উহা বোধশক্তি ও গতিশক্তি গ্রহণ করিতে পারে। যখন ঐ সাম্যভাব নষ্ট হয় তখন আর পারে না। জীবাত্মা এইরূপ অক্ষম হইয়া গেলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উহার আলোক হইতে বঞ্চিত থাকে ; সুতরাং সংজ্ঞাশূন্য ও গতিশক্তি রহিত হইয়া পড়ে। এই অবস্থা ঘটিলে লোকে বলে প্রাণীটি মরিয়া গিয়াছে। ইহাই মৃত্যুর অর্থ।

www.BANGLAKITAB.com

যে ব্যক্তি জীবাত্মার শীতোষ্ণতার সাম্যভাব বিনাশের উপকরণসমূহ সংগ্রহ করেন তিনি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন। তাঁহাকে মালেকুল মওত বলে। লোকে তাঁহার নাম জানে, কিন্তু তাঁহার হাকীকত বুঝে না। ইহা বুঝাও নিতান্ত দুষ্কর। জীবের মৃত্যুর বিষয় উপরে বর্ণিত হইল। মানুষের মৃত্যু কিন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র। কারণ, সর্বসাধারণের জীবের যে আত্মা আছে, মানুষের মধ্যেও তাহা আছে। ইহা ছাড়া মানুষের আরও একটি আত্মা আছে ; ইহাকে মানবাত্মা বলে। উপরের কয়েক অধ্যায়ে ইহার উল্লেখ হইয়াছে। মানবাত্মা জীবাত্মার সমজাতীয় নহে। জীবাত্মা সূক্ষ্ম বায়ু ও তেজ সদৃশ একটি শরীরী পদার্থ। কিন্তু মানবাত্মা শরীরী পদার্থ নহে ; কারণ, ইহা বিভক্ত হইতে পারে না। ইহাতে আল্লাহর মারিফাতের সমাবেশ হয়। আল্লাহ যেমন একক ও অবিভাজ্য তদ্রূপ তাঁহার মারিফাতও এক ও অবিভাজ্য। সুতরাং অবিভাজ্য মারিফাত কখনই বিভাজ্য পদার্থে সমাবেশ হইতে পারে না। ইহা শুধু সমজাতীয় অবিভাজ্য পদার্থেই স্থান পাইতে পারে।

জীবাত্মা মানবাত্মার তুলনা ঃ প্রদীপের ন্যায় মানবের মধ্যেও শলিতা, আলোক-শিখা ও জ্যোতি এই তিন পদার্থ আছে বলিয়া মনে কর। দেহ শলিতাতুল্য, জীবাত্মা প্রদীপশিখা এবং মানবাত্মা জ্যোতি-সদৃশ। প্রদীপের জ্যোতি যেমন প্রদীপ অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম এবং প্রদীপকে জ্যোতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না, তদ্রূপ মানবাত্মা ও জীবাত্মা অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম এবং মানবাত্মাকে জীবাত্মার সহিত তুলনা করা যাইতে পরে না। কেবল সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে বিচার করিলে এ তুলনা ঠিক হইবে, কিন্তু অন্য কোন সম্বন্ধে বিচার করিলে ঠিক হইবে না। প্রদীপের জ্যোতি প্রদীপের অস্তিত্বের অধীন এবং জ্যোতির মূল প্রদীপ। যতক্ষণ প্রদীপ জ্বলিবে ততক্ষণ জ্যোতি থাকিবে ; প্রদীপ নিবিয়া গেলে জ্যোতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু মানবাত্মা জীবাত্মার অধীন নহে ; বরং মানবাত্মা মুল এবং জীবাত্মা ধ্বংস হইলেই মানবাত্মা ধ্বংস হয় না। ইহার উপমা চাহিলে, মনে কর প্রদীপ অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম একটি জ্যোতি আছে এবং ইহাই প্রদীপের স্থিতির কারণ। ইহার স্থিতি প্রদীপের স্থিতির উপর নির্ভর করে না। তখন এই উপমাটি জীবাত্মা ও মানবাত্মার সম্পর্কের সহিত ঠিক হইবে। জীবাত্মাকে এক কারণে মানবাত্মার বাহন এবং অপর কারণে হাতিয়ার বলা চলে। জীবাত্মার সাম্যভাব নষ্ট হইলে শরীর মরিয়া যায় বটে কিন্তু মানবাত্মা তখনও স্থায়ী থাকে। তবে শরীর তখন বাহনবিহীন ও হাতিয়ার শূন্য হইয়া পড়ে। বাহন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আরোহীর অস্তিত্ব বিলীন হয় না ; আরোহী বাহনশূন্য হয় মাত্র। মানবাত্মাকে জীবাত্মারূপে হাতিয়ার এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা সে আল্লাহর মহব্বত ও তাঁহার মারিফাতরূপ শিকার ধরিয়া লইবে। শিকার ধরিয়া ফেলিলে হাতিয়ার সঙ্গে না থাকাই শিকারীর পক্ষে মঙ্গল ; কেননা সে তখন হাতিয়ারের বোঝা বহনের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পায়। এই মর্মেই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইয়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "মৃত্যু মু'মিনের জন্য উৎকৃষ্ট উপহার ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ–যেমন কোন শিকারী ফাঁদ, জাল ইত্যাদি লইয়া শিকারে বাহির হইল এবং এই সকলের বোঝাও তাহাকে বহন করিতে হইল। শিকার হস্তগত হইলে এই বোঝা তাহার উপর না থাকাই তাহার জন্য মঙ্গল। কিন্তু আল্লাহ না করুন ; শিকার হস্তগত হইবার পূর্বে শিকারী অস্ত্রশূন্য হইলে তাহার মর্মবেদনা ও বিপদের সীমা থাকে না। কবর আযাবরূপে এই মনস্তাপ ও মর্মবেদনার প্রথম সূত্রপাত হয়।

দেহ মানবের আসল সত্তা নহে ঃ কাহারও হস্ত-পদ অবশ হইয়া গেলেও তাহার অস্তিত্ব অটুট থাকে ; কেননা সে হস্তও নহে, পদও নহে। বরং হস্তপদ তাহার হাতিয়ার মাত্র। লোকে হস্ত-পদ নিজ নিজ কার্যে ব্যবহার করে। হস্ত-পদ যেমন তোমার আসল সত্তা নহে তদ্রূপ উদর, পৃষ্ঠ এমনকি সমস্ত দেহও তোমার মূল সত্তা নহে। তেমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া গেলেও তোমার বর্তমান থাকা সম্ভব। সমস্ত দেহ অবশ হইয়া যাওয়াকেই মৃত্যু বলে। হস্ত অবশ হওয়ার অর্থ এই যে, ইহা আর তোমার আজ্ঞাধীন নাই অর্থাৎ ইহার উপর তোমার ক্ষমতা চলিতেছে না। হস্তে এমন একটি গুণ ছিল যাহাকে শক্তি বলে। এই শক্তি বলেই হস্ত তোমার খেদমত করিত। ঐ শক্তি জীবাত্মারূপ প্রদীপের জ্যোতি ছিল। ইহা হস্তে প্রবেশ করিয়া হস্তকে কর্মক্ষমতা প্রদান করিত। যে শিরা দিয়া জীবাত্মার প্রভাব হস্তে প্রবেশ করিত সেই শিরায় কোনরূপ বন্ধন পড়িয়া গেলে হস্তের শক্তি বিনষ্ট হয় এবং ইহা কাজের অযোগ্য হইয়া পড়ে। এইরূপ জীবাত্মার প্রভাবে সমস্ত দেহ তোমার পরিচর্যা করে এবং তোমার আজ্ঞা মানিয়া চলে। জীবাত্মার সাম্যভাব নষ্ট হইলে দেহ তোমার আদেশ মানিয়া চলিতে পারে না, ইহাকেই মৃত্যু বলে। তোমার দেহ আজ্ঞাধীন না থাকিলেও অর্থাৎ পূর্বের ন্যায় জীবিত না থাকিলেও তুমি স্বয়ং পূর্ববৎ বিদ্যমান থাকিবে। এমতাবস্থায় দেহকে তোমার অস্তিত্বের মূল কিরূপে বলা যাইতে পারে ? তুমি চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে, শৈশবে তোমার যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল, তাহা এখন নাই। জীবনী-শক্তির প্রভাবে শৈশবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া গিয়াছে এবং তদস্থলে নূতন নূতন খাদ্যদ্রব্য নূতন নূতন উপাদান-সংযোগে নূতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন করিয়া দিয়াছে। শৈশবের দেহ এখন নাই ; কিন্তু শৈশবে যেই তুমি ছিলে এখনও সেই তুমিই রহিয়া গিয়াছ। সুতরাং তোমার অস্তিত্ব দেহের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নহে। দেহ বিনষ্ট হইয়া গেলেও তুমি স্বয়ং এইরূপই জীবিত থাকিবে।

মানুষের নিত্য ও অনিত্য গুণ ঃ মানুষের মধ্যে দুই প্রকার গুণ আছে। শরীরের সহিত এক প্রকার গুণের সম্বন্ধ এবং শরীরের উপরই উহা নির্ভরশীল। যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি। এ সমস্ত জড়দেহ ব্যতীত প্রকাশ পায় না এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে

www.BANGLAKITAB.com

একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। আর এক প্রকার গুণের শরীরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই; যেমন, আল্লাহর পরিচয় সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং তাঁহার চিরস্থায়ী সৌন্দর্য দর্শনের অনুরাগ ও আনন্দ। এইগুলি মানুষের নিজস্ব গুণ এবং তাহার সহিত চিরকাল থাকিবে। এই সমস্তই চিরস্থায়ী সদগুণ। মানুষের মধ্যে যদি আল্লাহর মারিফাতের পরিবর্তে তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞতা থাকে তবে ইহাও মানুষের নিজস্ব গুণ এবং ইহাও তাহার সহিত চিরকাল থাকিবে। এই অজ্ঞতা হইল মানবাত্মার অন্ধত্ব এবং মানুষের দুর্ভাগ্যের বীজ। এই মর্মেই আল্লাহ বলেন ঃ

مَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلاً -

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ থাকে সে পরকালেও অন্ধ থাকিবে এবং সে পথভ্রষ্ট।"

যতদিন তুমি মানুষের দুই প্রকার আত্মার মর্ম, ইহাদের পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিবে ততদিন তুমি মৃত্যুর অর্থ বুঝিতে পারিবে না।

মানবাত্মার দুনিয়াতে আগমনের উদ্দেশ্য ঃ জীবাত্মা এই নিম্ন জগতের পদার্থ। কেননা, রক্ত, শ্লেষ্মা পিত্ত, বাত এই চারি ধাতুর মিশ্রণজনিত তেজের সাম্যভাব হইতে ইহার উৎপত্তি। আগুন, পানি, মাটি ও বায়ু সেই চারি ধাতুর মূল। উষ্ণতা, শীতলতা, আদ্যতা ও শুষ্কতার তারতম্যের কারণে ঐ সকল ধাতুর মধ্যে অনৈক্য ও আনুকূল্য দেখা দেয়। চিকিৎসাবিদ্যার উদ্দেশ্য হইল ঐ চতুর্বিধ ধাতু ও জীবাত্মার মধ্যে এমন সাম্যভাব রক্ষা করা যাহাতে জীবাত্মা মানবাত্মার বাহনের উপযোগী হইয়া উঠে। মানবাত্মা নিম্ন-জগতের পদার্থ নহে, বরং উর্ধ্ব-জগতের পদার্থ এবং ফেরেশতাগণের সমজাতীয়। মুসাফির-স্বরূপ সে এই নিম্ন-জগতে আসিয়াছে ; সে নিজ ইচ্ছায় আসে নাই। আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়েত পালন করত স্বীয় পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইবার উদ্দেশ্য সে এ জগতে আগমন করিয়াছে ; যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ -

অর্থাৎ "আমি বলিলাম, তোমরা সকল এখান (বেহেশত) হইতে নিচে (অর্থাৎ নিম্ন-জগতে) যাও। তৎপর তোমাদের নিকট আমার হইতে যখন হিদায়েত আসিবে তখন যাহারা আমার হিদায়েতের অনুবর্তী হইবে, তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা অনুতাপ পাইবে না।" আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

اِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি মাটি হইতে মানুষ সৃষ্টি করিব। তৎপর যখন তাহাকে সমভাবে ঠিক করিয়া দিব এবং তাহার মধ্যে আমার আত্মা ফুঁৎকার করিয়া দিব-----।" এই বাক্যে দুইটি পৃথক আত্মার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তিনি একটির সহিত মাটির সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন এবং সমভাবে ইহাকে ঠিক করিয়া দেওয়ার বিষয় বলিয়াছেন। এই কথায় তিনি জীবাত্মার প্রকৃতিগত সমভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর অন্য আত্মার সন্ধান দিয়াছেন। 'তাহার মধ্যে আমার আত্মা ফুঁৎকার করিয়া দিব' এই বাক্যে তিনি মানবাত্মার সহিত নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। ইহার উদাহরণ এইরূপ---মনে কর, এক ব্যক্তি মিহিন ছিন্ন বস্ত্রে একটি মশাল প্রস্তুত করিয়া ইহাতে এমন উপকরণ সংযোগ করিয়া দিল যাহাতে ইহা অতি সহজে অগ্নি গ্রহণ করত প্রজ্বলিত হইতে পারে। তৎপর তাহা আগুনের নিকট লইয়া গিয়া ফুৎকার দেওয়ামাত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

জীবাত্মা ও মানবাত্মার স্বাস্থ্য ঃ জীবাত্মা নিম্ন-জগতের বস্তু, ইহার একটি সাম্যভাবে আছে। চিকিৎসাবিদ্যা জীবাত্মার এই সামভাব রক্ষার উপায় বাহির করিয়া শরীর হইতে পীড়া দূর করত জীবাত্মাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। মানবাত্মা উর্ধ্ব– জগতের বস্তু। ইহাই মানুষের মুল এবং ইহারও সাম্যভাব আছে। শরীয়ত হইতে প্রাপ্ত নীতিবিদ্যা ও রিয়াযত (চরিত্র সংশোধনে কঠোর সাধনা) এই সাম্যভাব রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখে। ইহাতেই মানবাত্মার স্বাস্থ্য ঠিক থাকে। বিনাশন পুস্তক ও পরিত্রাণ পুস্তকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইবে।

মানবাত্মার গুঢ় রহস্যবিশেষের বর্ণনা নিষিদ্ধ ঃ উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, নিজের পরিচয় না পাইলে যেমন আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায় না তদ্রূপ মানুষের আত্মার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও পরকালের অর্থ সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায় না। এইজন্য আত্মজ্ঞান যেমন আল্লাহর মারিফাতের কুঞ্জী সেইরূপ আত্মা বিষয়ক জ্ঞানও পরকাল-জ্ঞানের কুঞ্জী। আল্লাহ ও পরকালের বিশ্বাস স্থাপন করা ধর্মের মূল। এইজন্যই আত্মদর্শনের কথা প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আত্মা-দর্শনের মধ্যে মানবাত্মার গুণাবলীর একটি মূল দৃঢ় রহস্যের কথা এখনও বলা হয় নাই। ইহা বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং বর্ণনা করিলেও ইহা সকলে বুঝিতে পারিবে না। আবার আল্লাহর মারিফাত ও পরকালের পরিচয় ইহার উপর নির্ভর করে। সুতরাং নিজে নিজে আত্মার এই গুঢ় রহস্য বুঝিবার জন্য যথোপযুক্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা কর। কারণ, অন্যের নিকট হইতে এই গুঢ় রহস্যের কথা অনেকেই শুনিয়াছে কিন্তু বিশ্বাস করে নাই এবং ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া অবিশ্বাস করত বলিয়াছে, ইহা সম্ভবই নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

www.BANGLAKITAB.com

তাহারা আল্লাহর পবিত্র গুণ বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছে, উহা অভাব ও নিষ্ক্রিয়তা-মাত্র। এমতাবস্থায় মানুষের ঐরূপ গুণ আছে শুনিয়া তুমি কিভাবে বিশ্বাস করিবে? তদুপরি আল্লাহর ঐ গুণ সম্বন্ধে কুরআন হাদীসে স্পষ্টভাবে কোন উল্লেখ নাই। এই জন্যই লোকে ইহা শুনিয়া অস্বীকার করে। আর এই কারণেই নবী (আ)-গণ বলেন ঃ

تُكَلِّمُوْا النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ -

অর্থাৎ "লোকের সহিত তাহাদের বুদ্ধির পরিমাণ অনুসারে কথা বল।" কোন কোন নবী (আ)-র উপর ওহী নাযিল হইয়াছিল ঃ "আমার গুণাবলীর মধ্যে যাহা লোকে বুঝিতে পারিবে না তাহা তাহাদিগকে বলিও না। কারণ, তাহারা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া অস্বীকার করিবে এবং এই অস্বীকার তাহাদের জন্য ক্ষতিকর হইবে।"

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, জীবাত্মা মানবাত্মার উপর নির্ভরশীল ; কিন্তু মানবাত্মার অস্তিত্ব ও গুণ দেহের উপর নির্ভরশীল নহে। মৃত্যুর অর্থ মানবাত্মার ধ্বংস নহে ; বরং শরীরের উপর মানবাত্মার আধিপত্য লোপকেই মৃত্যু বলে।

পুনরুত্থান ঃ পুনরুত্থানের অর্থ এই নহে যে, ধ্বংস ও বিলোপের পর আত্মাকে পুনর্বার অস্তিত্বে আনয়ন করা হইবে। বরং ইহার অর্থ এই যে, আত্মাকে একটি শরীর প্রদান করা হইবে অর্থাৎ আর একবার শরীরকে আত্মার আজ্ঞাপালন করিবার জন্য গঠন করা হইবে। মৃত্যুর পর পুনরায় আত্মাকে শরীর দেওয়া আল্লাহর পক্ষে নিতান্ত সহজ ; কারণ, প্রথমবার আত্মা ও শরীর উভয়কেই সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুর পর আত্মা স্থায়ী থাকে এবং শরীরের উপাদানসমূহও নিজ নিজ স্থানে মৌজুদ থাকে। ইহাদিগকে একত্র করা নূতন সৃষ্টি অপেক্ষা অতি সহজ। আমাদের দৃষ্টির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ইহাকে সহজ বলা হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর কার্য সম্বন্ধে সহজ বা কঠিনের কোন কথাই উঠিতে পারে না। কারণ, যেখানে কঠিন কাজ আছে কেবল সেখানেই সহজ কাজের কথা উঠিতে পারে। (অথচ আল্লাহর পক্ষে কোন কিছুই কঠিন নহে)। দ্বিতীয়বার জীবিত করিবার সময় প্রথম বারের শরীর প্রদান করা জরুরী নহে। কারণ, শরীর বাহনমাত্র। ঘোড়া পরিবর্তন হইলে আরোহীর কোন পরিবর্তন হয় না। শৈশব হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের উপাদান দ্বারা সর্বদাই বদলিয়া যাইতেছে। কিন্তু মানবাত্মা সৃষ্টির সময়ে যেমন ছিল তেমনি থাকিয়া যায়।

পুনরুত্থানের সময় শরীর বিষয়ক বাদ-প্রতিবাদ ঃ যাঁহারা বলেন, পুনরুত্থানের সময় পূর্ব শরীর মিলিবে, তাঁহাদের কথার উপর অনেক প্রতিবাদ হইয়াছে। এই সকল প্রতিবাদের যে সমস্ত জওয়াব তাঁহারা দিয়াছেন উহা দুর্বল। যদি একজন অপরজনকে

ভক্ষণ করে এবং ভুক্ত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হজম হইয়া ভক্ষণকারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যায় তবে পুনরুত্থানের সময় ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাহাকে দেওয়া হইবে? আবার কাহারও শরীর হইতে যদি কোন অঙ্গ কাটিয়া ফেলা হয় এবং কাটিবার পর সে ব্যক্তি ইবাদত করে তবে ঐ ইবাদতের ফল ভোগ করিবার সময় ঐ কর্তিত অঙ্গ সেই ব্যক্তির শরীরে থাকিবে কি না? যদি না থাকে, তবে হস্ত-পদ চক্ষু-কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গহীন লোক বেহেশতে থাকিবে। আর যদি ঐ কর্তিত অঙ্গ শরীরে থাকে তবে উহা পুণ্যকর্মের অংশী না হইয়া কিরূপে পুণ্যের ফল ভোগ করিবে? অনেকে এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ করে এবং প্রতিপক্ষ বাহ্যাড়ম্বরে উহার উত্তর দিয়া থাকে। তুমি যখন বুঝিতে পারিয়াছ যে, দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়ার সময় প্রথম বারের শরীর পাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই তখন ঐরূপ বাজে প্রশ্নোত্তরেরও কোন প্রয়োজন নাই। উক্তরূপ প্রতিবাদের কারণ এই যে, তাহারা বুঝিয়াছে, শরীরের অস্তিত্বই তোমার অস্তিত্ব। অতএব, শরীরটি অবিকল না হইলে পূর্বে তুমি যেরূপ ছিলে তদ্রূপ হইতে পারিবে না। এই কারণেই তাহারা মুশকিলে পড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের ঐ সকল প্রতিবাদের মূল নিতান্ত দুর্বল।

তুমি হয়ত বলিতে পার, আইনজ্ঞ ও তার্কিকগণের সর্বজনবিদিত অভিমত এই যে, মৃত্যুতে জীবন নষ্ট হয়, পরে ইহাকে তৈয়ার করিতে হয়। সুতরাং এ গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইল তাহা এই মতের বিপরীত। ইহার উত্তর শুনিয়া লও। যে ব্যক্তি অন্যের কথা শুনিয়া চলে সে অন্ধ। আর যে-ব্যক্তি মানবাত্মা ধ্বংস হয় বলিয়া বিশ্বাস করে, সে মুকাল্লিদ (অনুবর্তী-বিশ্বাসী) ও চক্ষুষ্মান, এই দুই-এর কোনটাই নহে। চক্ষুষ্মান হইলে সে নিজেই বুঝিত যে, শারীরিক মৃত্যু মানুষের আসল সত্তাকে ধ্বংস করে না। আর মুকাল্লিদ হইলে কুরআন ও হাদীস হইতে জানিত যে, মানুষের আত্মা মৃত্যুর পরও আপন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

মৃত্যুর পরও মানবাত্মা অবিনশ্বর ঃ মৃত্যুর পর আত্মাসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। এক শ্রেণী দুর্ভাগা ব্যক্তিদের আত্মা এবং অপর শ্রেণী সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণের আত্মা। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণের আত্মা সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ـ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ -

অর্থাৎ "যাহারা আল্লাহর পথে শহীদ হইয়াছে তাহাদিগকে মৃত বলিয়া মনে করিও না ; বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট জীবিত আছে, জীবিকাও পাইতেছে ; আল্লাহ তাহার অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে যাহা দান করিতেছেন তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট।" বদর-যুদ্ধে নিহত দুর্ভাগা কাফিরদিগকে সম্বোধন করিয়া রাসূলে মাকবূল

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "হে অমুক, হে অমুক ; আল্লাহ তাঁহার শত্রুদের প্রতি শাস্তি দানের যে অঙ্গীকার আমার সঙ্গে করিয়াছিলেন আমি তাহা সত্য দেখিতে পাইলাম। আর আল্লাহ তোমাদিগকে শাস্তি প্রদানে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পর তোমরাও কি তাহা সত্য পাইয়াছ? ইহা শুনিয়া সাহাবা (রা)-গণ নিবেদন করিলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! এ কাফিরগণ তো মরিয়া গিয়াছে ; আপনি কিরূপে তাহাদের সহিত কথা বলিতেছেন? তিনি বলিলেন ঃ যে আল্লাহর হাতে মুহম্মদ-এর জীবন তাঁহার শপথ, তাহারা আমার কথা তোমাদের অপেক্ষা ভালরূপে শুনিতেছে ; কিন্তু উত্তর দিতে অক্ষম। কুরআন শরীফের যে সকল আয়াত ও যে সকল হাদীস মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে এবং সে-স্থলে উক্ত হইয়াছে যে মৃতগণ শোকাতুর ও কবর যিয়ারতকারীকে দেখিতে পায়, এমনকি ইহজগতে যাহা কিছু হইতেছে, সবই জানিতে পারে সেই সমুদয় চিন্তা করিলে আপনা-আপনিই জানা যায় এবং বিশ্বাস হয় যে, মৃত ব্যক্তির বিনাশ শরীয়তের কোথাও নাই। বরং ইহাই আছে যে, মৃত্যুতে মানুষের ভাব ও বাসস্থান-মাত্র বদলিয়া থাকে ; আর কবর কাহারও পক্ষে দোযখের গর্তসমূহের একটি গর্তে পরিণত হয়, আবার কাহারও পক্ষে বেহেশতের মনোরম উদ্যান–সমূহের অন্যতম উদ্যান হইয়া পড়ে। সুতরাং নিশ্চয় বিশ্বাস কর, মৃত্যুতে তোমার নিজস্ব সত্তার বা তোমার আত্মিক ভাবের কোনই পরিবর্তন ঘটিবে না। কিন্তু মস্তিষ্ক ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত সে সকল ইন্দ্রিয়, চলন-শক্তি ও চিন্তা–শক্তির সম্বন্ধ উহা লোপ পাইবে এবং তুমি ইহজগত হইতে যেমন যাইবে পরলোকে তেমনিই থাকিবে।

এ কথাটিও বুঝিয়া লও যে, বাহনের অশ্ব মরিয়া গেলে আরোহীর স্বীয় স্বাভাবিক গুণের তারতম্য ঘটে না, অর্থাৎ আরোহী অজ্ঞান থাকিলে বাহনের মৃত্যুর পর সে জ্ঞানী হইয়া উঠে না এবং অন্ধ থাকিলে চক্ষুস্মান হয় না। তবে অশ্বের অভাবে আরোহী নিশ্চয়ই পদাতিক হইয়া পড়ে। শরীর অশ্বতুল্য বাহন এবং তুমি আরোহী।

দুনিয়াতে পরলোকের অবস্থা দর্শন ঃ উল্লিখিত কারণে যে ব্যক্তি নিজকে ও বাহ্য জড়জগতকে ভুলিয়া কেবল নিজের আত্মাতে অবতীর্ণ হইতে পারেন এবং তাসাওউফের প্রারম্ভ মুরাকাবায় অর্থাৎ আল্লাহর চিন্তায় একেবারে ডুবিয়া থাকিতে পারেন, তিনি পরকালের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতে পান। কারণ, তদ্রূপ অবস্থায় জীবাত্মা যদিও শীত-গ্রীষ্মের সমভাব হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় না তথাপি নিতান্ত দুর্বহ হইয়া পড়ে। অতএব তাঁহার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় ও পরকালের ভাবনা প্রবল হইয়া উঠে। এমতাবস্থায় জীবাত্মা মানুষের আসল সত্তাকে নিজের দিকে লিপ্ত করিয়া রাখে না। এই সময় তাঁহার অবস্থা মৃত ব্যক্তির অবস্থার প্রায় সমান হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই মৃত্যুর পর লোকে যাহা জানিতে পারে তাহা এ দুনিয়াতেই তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া

পড়ে। তৎপর ঐ অবস্থা হইতে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া আবার জড়জগতে প্রবেশ করিলে যাহা তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার কিছুই অনেকের মনে থাকে না। ইহার সামান্য প্রভাব মাত্র বিদ্যমান থাকে। তাঁহাকে ঐ সময়ে বেহেশতের অবস্থা দেখানো হইয়া থাকিলে তাঁহার মনে ইহার আনন্দ ও আরামটুকু থাকিয়া যায়। আর তাঁহাকে দোযখের অবস্থা দেখানো হইয়া থাকিলে ইহার ভীতি ও শাস্তি তাঁহার মনে রহিয়া যায়। দৃষ্টবস্তুর মধ্যে কোন কিছু মনে থাকিলে ইহার সংবাদ অপরকে দিতে পারেন। স্মরণশক্তি দৃষ্টবস্তুকে কোন পরিচিত বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া লইতে পারিলে উহা খুব স্মরণ থাকে এবং পরে ইহার সংবাদ অপরকে দেওয়া চলে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, একবার রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামায পড়িবার সময় হস্ত বিচার করত বলিলেন ঃ "বেহেশতের আঙ্গুর-গুচ্ছ আমাকে দেখানো হইয়াছিল। আমি উহা এই জগতে আনিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম।" ইহাতে মনে করিও না যে, যে পদার্থের সহিত আঙ্গুর-গুচ্ছের তুলনা করা হইয়াছিল তাহা এই জগতে আনিবার বস্তু। বরং উহা এই জগতে আনয়ন করা একেবারে অসম্ভব ছিল। অসম্ভব না হইলে রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম লইয়া আসিতেন। অসম্ভব হওয়ার কারণ বুঝা দুষ্কর এবং ইহার অনুসন্ধান তোমার কোন প্রয়োজন নাই। এ ঘটনা বুঝিবার তারতম্যে আলিমগণের মর্তবায় শ্রেণীভেদ হইয়াছে ; যেমন কেহ এইমাত্র ভাবিয়াছে যে, বেহেশতের আঙ্গুরগুচ্ছ কি? ইহা কিরূপ ছিল যে, হযরত (সা)-এর নামাযে থাকিয়া হস্ত সঞ্চালন ঘটানকে অবলম্বন করিয়া শুধু এই কথা বলিল যে, হযরত (সা) হস্ত সঞ্চালন করিলেন। অতএব, নামাযে রতকালীন অল্প কাজ নামায নষ্ট করে না। তাহারা ঐ ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করত ধারণা করিয়া লইয়াছে যে, পূর্ববর্তী সকল আলিম ঐ ঘটনা হইতে তাহাদের ন্যায় শুধু ইলমে জাহিরীই লাভ করিয়াছে। যাহারা এইরূপ বুঝিয়া পরিতুষ্ট রহিয়াছে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করে নাই তাহাদের জীবন বৃথা ও তাহারা শরীয়তে অবিশ্বাসী।

মি'রাজ ঃ এ পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল তাহা প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারিবে যে, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে কেবল হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালামের নিকট শুনিয়া বেহেশতের সংবাদ জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে ; বরং তিনি স্বয়ং বেহেশতের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং সেই সংবাদ দুনিয়াতে প্রকাশ করিয়াছেন। দুনিয়াতে থাকিয়া কেহ বেহেশতের অবস্থা জানিতে পারে না সত্য ; কিন্তু রাসূল মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি এ দুনিয়া অতিক্রমপূর্বক পরলোক পর্যন্ত পৌঁছিয়া ছিল। এই জন্যই তিনি উহা দেখিতে

www.BANGLAKITAB.com

পাইয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ অবস্থাকেও এক প্রকার মি'রাজ বলা চলে। এই শ্রেণীর মি'রাজ ঐ প্রকারে হইয়া থাকে। ১. জীবাত্মার মৃত্যু হইলে ও ২. জীবাত্মা একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িলে।

পরলোক দর্শনের ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্র ঃ এ দুনিয়াতে কেহই বেহেশত দেখিতে পাইবে না। সাত আসমান ও যমীনকে যেমন একটি প্রস্তর ছিলকার ভিতরে পুরা অসম্ভব; তদ্রূপ বেহেশতের এক রেণুও সমস্ত দুনিয়াতে সমাবেশ হওয়া অসম্ভব। আকাশ ও পৃথিবীর ছবি চক্ষে পড়িলে দর্শন-জ্ঞান জন্মিতে পারে বটে ; কিন্তু কান দ্বারা উহা দর্শন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইরূপ এ জগতের সমস্ত ইন্দ্রিয় বেহেশতের একটি রেণু সম্বন্ধেও অবগত হইতে একবারে অক্ষম। পরকাল-দর্শনের ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কবর-আযাব ঃ এখন কবর-আযাব সম্বন্ধে অবগত হওয়ার সময়। কবর আযাব দুই প্রকার–১. আত্মিক ও ২. শারীরিক। শারীরিক আযাব সকলেই বুঝে ; কিন্তু আত্মার আযাব সকলে বুঝে না। যিনি নিজকে চিনিয়াছেন এবং উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আত্মার স্থিতি শরীরের স্থিতির সাপেক্ষ নহে, তিনিই আত্মার আযাব বুঝিতে পারেন। মৃত্যু ঘটিলে মানুষ ধ্বংস পায় না, বরং বিদ্যমান থাকে। তখন তাহার নিকট হইতে হস্ত, পদ , চক্ষু, কর্ণ, ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় ফিরাইয়া লওয়া হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ ফিরাইয়া লইলে তদসঙ্গে স্ত্রী-পুত্র, ভূ-সম্পত্তি, দাস-দাসী, গো-মহিষ, ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন এমনকি আসমান– যমীন এবং যাহা কিছু পার্থিব ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে তৎসমুদয়ই কাড়িয়া লওয়া হইবে। মানুষ যদি দুনিয়াতে এই সকল পদার্থের প্রতি আসক্ত থাকে এবং এই সমস্তের মধ্যেই নিজকে ডুবাইয়া রাখে তবে মৃত্যুর পর উহাদের বিচ্ছেদজনিত কষ্ট সে স্বভাবতই ভোগ করিবে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি সংসারের যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত এবং এ জগতের কোন কিছুর প্রতিই আসক্ত নহে, তদুপরি সর্বদা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইয়া থাকে সে মৃত্যুর পর সুখে শান্তিতে থাকিবে। আবার এই ব্যক্তি যদি আল্লাহর ভালবাসা লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার স্মরণে অনুরক্ত হইতে পারেন, তাঁহার নিকট নিজকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দিতে পারেন এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তু হইতে বীতশ্রদ্ধ ও পরাঙ্মুখ হইতে পারেন তবে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবেন। কারণ তাঁহার সহিত মিলনের পথে দুনিয়ার যে–সকল বস্তু প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় মৃত্যুতে উহা বিদূরিত হয় এবং মানুষ চরম সৌভাগ্য লাভ করে।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, লোকে যদি বুঝে যে, মৃত্যুর পরেও সে থাকিবে এবং ভালবাসার সকল বস্তু দুনিয়াতে পড়িয়া থাকিবে তবে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, মৃত্যুর পর প্রিয় পদার্থের বিচ্ছেদজনিত যাতনা ও শাস্তি তাহাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। এই উপলক্ষেই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اَحْبِبْ مَا اَحْبَبْتَ فَاِنَّكَ مُفَارِقُهُ ـ

অর্থাৎ "যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তুমি ভালবাস, কিন্তু তাহা হইতে তুমি নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন হইবে।"

যদি কেহ একমাত্র আল্লাহকে প্রিয়পাত্র জানিয়া সংসার হইতে কেবল পরিমিত পাথেয় সংগ্রহ করত অবশিষ্টগুলিকে শত্রুজ্ঞানে বর্জন করেন তবে অবশ্যই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে, ইহলোক পরিত্যাগের পর সকল যাতনা হইতে মুক্তি পাইবে এবং পরম শান্তি লাভ করিবে।

উপরের কথাগুলি বুঝিলে কবর– আযাব সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না এবং দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, উহা সত্য, কিন্তু পরহেজগারদের জন্য নহে, বরং দুনিয়াদারদের জন্য, যাহারা নিজদিগকে সম্পূর্ণরূপে দুনিয়াতে লিপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ কথাগুলি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে–

اَلدُّنْيَا سِجْنُ اَلْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ ـ

["দুনিয়া মু'মিনের কারাগার এবং কাফিরের বেহেশত"] এই হাদীসের মর্মও বুঝা যাইবে।

কবর-আযাবের তারতম্য ঃ দুনিয়ার মহব্বত যে কবর-আযাবের মূল ইহা জানিয়াছ। এখন জানিয়া রাখ যে, কবর–আযাবের তারতম্য হইয়া থাকে। অবস্থাভেদে ইহা কাহারও উপর অধিক, আবার কাহারও উপর অল্প হইয়া থাকে। দুনিয়ার মহব্বত যাহার যত অধিক তাহার উপর আযাবও তত অধিক হইয়া থাকে। দুনিয়াতে যাহার ভূ-সম্পত্তি, দাস-দাসী, হস্তী, অশ্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং যে এই সকল বস্তুর প্রতি আসক্ত তাহার প্রতি যত কঠিন আযাব হইবে, যাহার সমস্ত বিশ্বের মধ্যে মাত্র একটি বস্তু আছে এবং যে এইমাত্র ইহার প্রতিই আসক্ত তাহার তত কঠিন আযাব হইবে না। কোন ব্যক্তির একটি অশ্ব চোরে লইয়া গেলে তাহার যেরূপ দুঃখ হইবে, দশটি অশ্ব লইয়া গেলে তদপেক্ষা অধিক কষ্ট হইবে। কাহারও অর্ধেক ধন লোকে ছিনাইয়া লইলে তাহার যে পরিমাণে কষ্ট হয়, সমস্ত ধন লইয়া গেলে ইহার দ্বিগুণ কষ্ট হইয়া থাকে। আবার সেই ধনের সহিত যদি তাহার স্ত্রী -পুত্র কাড়িয়া লইয়া যায়, তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করে, তাহার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে নিঃসঙ্গ ও অসহায় একাকী ছাড়িয়া যায় তবে তাহার দুঃখের কোন সীমা থাকে না। জীবনাবসানে মৃত্যুর কার্যও এইরূপ। মানুষ যে পরিমাণে দুনিয়াকে বর্জন বা মহব্বত করিবে এই সেই তাহার আরাম বা কষ্ট হইবে। যাহার প্রতি দুনিয়া যত প্রসন্ন হয় এবং সেও নিজেকে যে

www.BANGLAKITAB.com

পরিমাণে দুনিয়াতে ডুবাইয়া রাখে সেই পরিমাণেই সে দুনিয়াকে ভালবাসে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ -

অর্থাৎ "উহা এইজন্য যে, তাহারা দুনিয়ার জীবনকে পরকাল অপেক্ষা অধিক "ভালবাসিয়াছিল।" আর তাহার প্রতি তত কঠিন শাস্তিই হইয়া থাকে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا -

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আমার যিকির হইতে মুখ ফিরাইয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার জন্য অধিক কষ্টময় জীবিকা রহিয়াছে।"

এই আয়াত নাযিল হইলে রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবা (রা)-গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "কোন অর্থে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে তোমরা জান কি?" তখন নিবেদন করিলেন ঃ "ইহার অর্থ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ভাল জানেন।" তখন তিনি বলিলেন ঃ "কবরে কাফিরকে শাস্তি দিবার জন্য নিরানব্বইটি অজগর নিযুক্ত করা হইবে। প্রত্যেকটি সর্পের নয়টি করিয়া মস্তক হইবে। ইহারা কাফিরকে কিয়ামত পর্যন্ত কামড়াইবে ও চাটিবে এবং তাহার উপর ফোঁসফোঁস করিতে থাকিবে।" চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ এই সর্পগুলিকে অন্তরের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু তদ্রূপ দর্শন–শক্তি হীন নির্বোধরা বলে ঃ "আমরা কাফিরের কবর দেখিয়া থাকি ; কিন্তু তথায় কিছুই দেখিতে পাই না। আমাদের তো বেশ দৃষ্টিশক্তি আছে ; সাপ থাকিলে আমরাও দেখিতে পাইতাম।" এই নির্বোধদের জানা উচিত, ঐ সাপ মৃত ব্যক্তির আত্মাতে আছে, বাহিরে নহে যে অপর লোকে দেখিতে পাইবে। বরং সেই সাপ মৃত্যুর পূর্ব হইতেই তাহার ভিতরে ছিল ; অথচ এ সম্বন্ধে সে কিছুই জানিত না। ঐ নির্বোধদের আরও জানা উচিত যে, সেই সাপ কাফিরের স্বীয় কু-স্বভাব হইয়া জন্মে ; আর সেই সাপের মাথার সংখ্যা তাহার কুস্বভাবের শাখার সংখ্যার সমান হইয়া থাকে। দুনিয়ার মহব্বত হইতে সাপের উৎপত্তি এবং দুনিয়ার মহব্বত হইতে কাফিরের মধ্যে যতগুলি কুস্বভাব জন্মে সাপের ততগুলি মাথাই হইয়া থাকে। কু-স্বভাব অনেক, যেমন–হিংসা, শত্রুতা, রিয়া, অহংকার, লোভ, প্রবঞ্চনা, সম্মান ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা। ঐ সাপের উৎপত্তির কারণ এবং ইহার মস্তকের বহুলতা দর্শন– শক্তির জ্যোতিতে দেখা যায়। নবুয়তের জ্যোতিতে ইহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। সর্পের ফণার সংখ্যা কুস্বভাবের সংখ্যার সমান। কাহার মধ্যে কতগুলি কুস্বভাব

আছে, তাহা আমরা জানি না। সুতরাং ঐ সর্প কাফিরের হৃদয়ে গুপ্তভাবে বাস করে, আল্লাহ ও রাসূলকে চিনে না বলিয়া যে তাহাদের হৃদয়ে সাপের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নহে, বরং তাহারা নিজদিগকে দুনিয়াতে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ -

অর্থাৎ "উহা এইজন্য যে, তাহারা দুনিয়ার জীবনকে পরকাল অপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াছিল।" আল্লাহ আরও বলেন ঃ

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيٰوتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا -

অর্থাৎ "তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ এবং দুনিয়াতে উহা ভোগ করিয়াছ।"

কাফিরদের হৃদয়ে সর্প না থাকিয়া দংশন যন্ত্রণা অবশ্য কিছু সহজ হইত। কারণ বাহিরে থাকিলে কোন সময় অন্তত এক মুহূর্তের জন্য সর্প দংশন হইতে বিরত থাকিত।

আত্মাতে ভাবরূপে সর্প মিশ্রিত থাকায় কাফির উহার দংশন-যন্ত্রণা হইতে কিরূপে পালাইয়া বাঁচিতে পারে? মনে কর কাহারও একটি সুন্দরী দাসী ছিল। কিছু দিন পর দাসীকে বিক্রয় করিয়া সে বুঝিতে পারিল যে, ঐ দাসীর প্রতি তাহার ভালবাসা ছিল এবং তখন এই ভালবাসা প্রবল হইয়া উঠিল। বিক্রয়ের পর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা তাহাকে সর্পবৎ দংশন করিতে লাগিল। ভালবাসা পূর্ব হইতেই তাহার হৃদয়ে সর্পবৎ গুপ্তভাবে ছিল। একত্র থাকাকালে সেই ভালবাসার বিন্দু-বিসর্গ সে অনুভব করিতে পারে নাই। বিচ্ছেদের পর সেই গুপ্ত ভালবাসা প্রবলভাবে প্রকাশ পাইয়া তাহার হৃদয়ে দংশন করিতে লাগিল। এই প্রকার নিরানব্বইটি সর্প ঐ কাফিরের হৃদয়ে মৃত্যুর পূর্ব হইতেই গুপ্তভাবে ছিল। অথচ ইহার বিন্দু-বিসর্গও সে জানিতে পারে নাই। প্রেয়সীর সহিত অবস্থানকালে ঐ ভালবাসা যে পরিমাণে সুখকর থাকে, বিচ্ছেদের পর ইহা সেই পরিমাণে যন্ত্রণার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আসক্তি ও ভালবাসা না থাকিলে বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা হইত না। এইরূপ দুনিয়ার মায়া ও আসক্তি দুনিয়াতে সুখের কারণ হয় বটে, কিন্তু মৃত্যুর পর উহার আবার যন্ত্রণার মূল কারণ হইয়া থাকে। ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্তি অজগর সর্প তুল্য। ধনাসক্তি সর্প সদৃশ। ঘর-বাড়ির প্রতি আসক্তি বিচ্ছুর ন্যায়। পার্থিব অন্য বিষয়াদির অবস্থাও এইরূপ বুঝিয়া লইবে। রূপবতী রমণীর প্রতি প্রেমাসক্তি বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া যেমন পানিতে ডুবিয়া আগুনে পুড়িয়া অথবা সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যুবরণ করত সেই তীব্র

www.BANGLAKITAB.com

বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতে ইচ্ছে করে, সেইরূপ যাহার উপর কবর-আযাব হইতে অব্যাহতি পাইতে ইচ্ছা করে ; বাহিরের সাপ শরীরের বাহিরে থাকিয়া বাহ্য অঙ্গে দংশন করে ; কিন্তু ঐ অজগর আত্মার ভিতরে থাকিয়া মর্মস্থল ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে। অথচ এ অজগরকে প্রকাশ্য চক্ষে কেহই দেখিতে পায় না।

উক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, প্রত্যেকেই কবর-আযাবের উপাদান দুনিয়া হইতে সঙ্গে লইয়া যায় এবং উহা তাহার হৃদয়ে গুপ্তভাবে থাকে এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ عَلَيْكُمْ -

অর্থাৎ "একমাত্র তোমাদের কৃতকর্মসমূহই তোমাদের প্রতি ফিরাইয়া আনা হইবে।" আর এইজন্যই আল্লাহ বলেন ঃ

كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ - لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ - ثُمَّ - لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ -

অর্থাৎ "তোমাদের যদি বিশ্বস্ত জ্ঞানে জানিতে তবে তোমরা অবশ্যই দোযখ দেখিতে পাইতে। অনন্তর তোমরা এমন দেখাই দেখিবে যে, তোমাদের চক্ষুর বিশ্বাস জন্মিবে।" আল্লাহ এ সম্বন্ধে বলেন ঃ

اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ -

অর্থাৎ "দোযখ কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং উহা তাহাদের সঙ্গেই আছে।" 'দোযখ কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়া লইবে' এই কথা আল্লাহ বলেন নাই।

কবরে সর্প দংশনের অর্থ ঃ তুমি হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পার, শরীয়তের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, ঐ সকল অজগরকে এই চর্মচক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু যে সকল অজগর আত্মা দংশন করে, তাহা দেখা যায় না। ইহার উত্তর শুন, ঐ অজগরদিগকে দেখিতে পাওয়া সম্ভব ; কিন্তু মৃতগণই দেখিতে পায় ; দুনিয়াতে চক্ষু দ্বারা কেহই দেখিতে পারে না। মৃতব্যক্তি জীবিতাকারে সর্পকে যে আকারে দেখিয়াছিল, মৃত্যুর পর সর্পগুলি তাহার নিকট ঐ আকারেই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু তোমরা উহা দেখিতে পাইবে না ; যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি অনেক সময় স্বপ্নে দেখে যে তাহাকে সাপে দংশন করিতেছে, অথচ তাহার নিকট উপবিষ্ট জাগ্রত ব্যক্তি সেই সাপ দেখিতে পায় না। স্বপ্ন দর্শকের নিকট সাপ বর্তমান এবং ইহার দংশনজনিত যন্ত্রণাও সে ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু জাগ্রত ব্যক্তি সাপের কিছুই দেখিতে পায় না।

আর জাগ্রত ব্যক্তি দেখিতে পায় না বলিয়া স্বপ্নদর্শকের দংশন-যন্ত্রণা কম হয় না। কোন ব্যক্তি নিজকে স্বপ্নে সর্পদষ্ট দেখিলে ইহার অর্থ এই যে, কোন শত্রু তাহার উপর জয়ী হইবে শত্রুর আঘাতই সাপের দংশন। স্বপ্নাবস্থায় সাপের দংশন-যন্ত্রণা আত্মিক ; কারণ ইহা আত্মাতে প্রকাশ পায়। যদি সেই স্বপ্নদর্শকের উপর তাহার শত্রু প্রবল হইয়া যন্ত্রণা দিতে থাকে তবে সে ব্যক্তি আপন স্বপ্নের অর্থ সফল দেখিয়া বলে ঃ "এরূপ যন্ত্রণা অপেক্ষা সর্প-দংশন যন্ত্রণা আমার পক্ষে ভাল ছিল। আহা! এই শত্রু যদি আমার উপর জয়ী না হইত।" কারণ, সর্পদংশনের যন্ত্রণা শরীরের উপর, আর শত্রুর দৌরাত্ম্যের যন্ত্রণা মনের উপর। এই জন্যই শত্রুর যন্ত্রণা দুঃসহ।

এখন যদি কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলে যে, স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট সর্পের অস্তিত্ব নাই ; স্বপ্নদর্শকের উপর যে অবস্থা ঘটে তাহা অলীক খেয়াল মাত্র তবে জানিয়া রাখ, তুমি বড় ভ্রমে পড়িয়াছ। ঐ সাপ আছে, কেননা যাহা আছে তাহাই পাওয়া যায় এবং যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা পাওয়া যায় না। যাহা তুমি স্বপ্নে পাইয়াছ ও দেখিয়াছ তাহা অপর কেহই দেখিতে না পাইলেও উহা তোমার জন্য নিশ্চয়ই আছে। যাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ না তাহা দুনিয়ার সমস্ত লোকে দেখিতে পাইলেও উহা তোমার পক্ষে নাই। মৃত ও নিদ্রিত ব্যক্তি যখন শাস্তি এবং শাস্তির উপকরণ উভয়ই পাইতেছে তখন লোকে না দেখিলেও কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

স্বপ্নদর্শক ও মৃত ব্যক্তির প্রভেদ ঃ মৃত ব্যক্তি ও নিদ্রিত ব্যক্তির শাস্তির প্রভেদ এই যে, নিদ্রিত ব্যক্তি তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠে এবং শাস্তি হইতে মুক্তি পায়। সুতরাং লোকে বলে, উহা অলীক খেয়াল মাত্র ছিল। কিন্তু মৃত ব্যক্তির শাস্তির ও যন্ত্রণার বিরাম নাই, সে উহাতে সর্বদা নিপতিত থাকে। কারণ, নিদ্রার সীমা আছে ; কিন্তু মৃত্যুর সীমা নাই। এইজন্য যন্ত্রণা মৃত ব্যক্তির সঙ্গেই থাকে। জড়জগতের পদার্থ যেমন জীবিত লোকের নিকট সুস্পষ্ট, মৃত ব্যক্তির নিকট শাস্তির উপকরণও তদ্রূপ সুস্পষ্ট। কবরের সাপ, বিচ্ছু ও অজগর সাধারণ লোকে এই দুনিয়াতে থাকিয়া চর্মচক্ষে দেখিতে পাইবে, এমন কথা শরীয়তে নাই। কিন্তু কেহ যদি এই দুনিয়া হইতে কিছু দূরবর্তী হয় অর্থাৎ নিদ্রাভিভূত হয় এবং সেই সময় তাহাকে মৃতদের অবস্থা দেখানো হয় তবে সে তাহাদিগকে সাপ-বিচ্ছু দংশন করিতেছে দেখিতে পাইবে। আম্বিয়া ও আওলিয়াগণ জাগ্রত অবস্থায় উহা দেখিতে পান। কারণ, অপর লোকে স্বপ্নে যাহা দেখে তাঁহারা জাগ্রতাবস্থায় তাহা দেখিতে পান। কেননা জড়জগতের পদার্থ পরকালের অবস্থাদর্শনে তাঁহাদের জন্য কোন প্রতিবন্ধক নহে। এই বিস্তৃত আলোচনার কারণ এই যে, দুনিয়াতে একদল নির্বোধ লোক আছে তাহারা কবরে সর্পাদি কিছুই দেখিতে না পাইয়া কবর-আযাবকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বসে। পরকালের অবস্থা জানে না বলিয়াই তাহারা কবর- আযাব অস্বীকার করিয়া থাকে।

www.BANGLAKITAB.com

দুই শ্রেণীর লোক কবর-আযাব হইতে মুক্ত ঃ এখন তুমি হয়ত বলিতে পার, সংসারাসক্তি যখন কবর-আযাবের কারণ তখন ইহা হইতে কেই মুক্তি পাইবে না। কেননা দুনিয়াতে সকলেই স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন ও ধনৈশ্বর্যকে ভালবাসে। সুতরাং সকলকেই কবর-আযাব ভোগ করিতে হইবে, কেহই তাহা হইতে রক্ষা পাইবে না। ইহার উত্তর এই যে, তোমার কথা ঠিক নহে। কারণ, দুনিয়াতে এমন বহু লোক আছেন যাঁহারা পার্থিব বস্তু উপভোগ করত পরিতৃপ্ত হইয়াছেন এবং দুনিয়ার কোন বস্তুই এখন তাহাদিগকে আনন্দ ও শান্তি দান করিতে পারে না। তাঁহারা সর্বদা মৃত্যুর প্রতিক্ষায় প্রস্তুত হইয়া থাকেন। মুসলমানদের মধ্যে বহু লোক এই কারণে সংসার বিরাগী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের কবর-আযাব হইবে না।

ধনবানগণের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা দুনিয়ার ভোগ বস্তুকে ভালবাসেন বটে, কিন্তু তদসঙ্গে আল্লাহকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। এই শ্রেণীর লোকেরও কবর–আযাব হইবে না। দৃষ্টান্ত এইরূপ– মনে কর, এক ব্যক্তির শহরে একটি বাড়ি আছে এবং তিনি ইহাকে খুব ভালবাসেন। কিন্তু তিনি প্রভুত্ব, রাজত্ব এবং উপবন– সুশোভিত রাজপ্রাসাদ তদপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। এমতাবস্থায় তিনি যদি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া সেই দেশের রাজধানীতে সুশোভিত রাজপ্রাসাদে বাস করিবার সুযোগ লাভ করেন তবে পূর্বের গৃহ পরিত্যাগ করিতে তাঁহার কিছুই কষ্ট হয় না। কারণ রাজত্ব ও রাজ-প্রাসাদের প্রবল আসক্তির প্রভাবে তাঁহার পূর্ব শহর ও গৃহের আসক্তি অতি তুচ্ছ ও নগণ্য হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে পূর্ব গৃহের আসক্তি একেবারে বিলীন হইয়া যায়। আম্বিয়া, আওলিয়া, আল্লাহভীরু মুসলমানগণের মন স্ত্রী-পুত্র, বাসস্থান ইত্যাদির প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট থাকিলে আল্লাহর প্রতি তাঁহাদের মনে যে স্বাভাবিক প্রবল মহব্বত থাকে এবং ইহার আনন্দ যখন তাঁহারা অনুভব করন তখন অন্য সকল আসক্তি ইহার সম্মুখে একেবারে বিলীন হইয়া যায়। আর মৃত্যুতে তাঁহারা এই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। এইজন্যই তাঁহাদের কবর-আযাব হয় না।

কবর-আযাবের উপযোগী ব্যক্তি ঃ ধনবানগণের অপর শ্রেণীর লোকে দুনিয়ার ভোগ্যবস্তুকে অত্যধিক ভালবাসে। তাহারা কবর-আযাব হইতে অব্যাহতি পাইবে না। দুনিয়াতে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অধিক। এই জন্যই আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا ـ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ـ

অর্থাৎ "তোমাদের প্রত্যেককেই দোযখের উপর দিয়া গমন করিতে হইবে। ইহা তোমাদের প্রভুর অবশ্য করণীয় বলিয়া তিনি নির্ধারিত করিয়া লইয়াছেন। তিনি

নিশ্চয়ই ইহা আদায় করিবেন।" অনন্তর যাহারা পরহিযগারী করিয়াছে তাহাদিগকে তিনি মুক্তি দিবেন। এই শ্রেণীর লোক দুনিয়ার মহব্বতের তারতম্যানুসারে মৃত্যুর পর কিছু কম বা বেশি শাস্তি ভোগ করিবে। তৎপর দীর্ঘকাল গত হইলে দুনিয়ার ভোগ্যবস্তুর আস্বাদের আনন্দ ক্রমশ ভুলিয়া গেলে আল্লাহর মহব্বত যাহা তাহাদের হৃদয় পূর্ব হইতেই গুপ্তভাবে ছিল প্রবল হইয়া উঠিবে। তখন তাহারাও শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে। এই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মনে কর, এক ব্যক্তি একটি বাড়িকে অপর বাড়ি অপেক্ষা অধিক ভালবাসে অথবা এক শহরকে অন্য শহর অপেক্ষা বা এক রমণীকে অপর রমণী অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। যে বাড়ি, শহর বা রমণীকে সে অধিক ভালবাসে তাহা হইতে দূরে সরাইয়া যাহাকে সে কম ভালবাসে তাহার নিকট তাহাকে রাখিয়া দিলে উক্ত প্রিয়তম বস্তুর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা তাহাকে দীর্ঘকাল ভোগ করিতে হয়। পরিশেষে যখন সে ঐ প্রেমাস্পদকে একেবারে ভুলিয়া যায় তখন শেষোক্ত অল্প প্রিয়ের প্রতি তাহার ভালবাসা প্রবলভাবে জাগিয়া উঠে।

অবিরাম শাস্তির উপযোগী ব্যক্তি ঃ যাহাদের হৃদয়ে লেশমাত্রও আল্লাহর মহব্বত নাই তাহারা অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করিবে। কারণ, তাহাদের হৃদয় কেবল দুনিয়ার মহব্বতেই পরিপূর্ণ। মৃত্যুতে সেই প্রিয়তম দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা হইতে সে কিরূপে অব্যাহতি পাইবে? কাফিরগণ যে সর্বদা অবিরাম শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে, ইহাই তাহার অন্যতম কারণ।

আল্লাহর প্রতি মহব্বতের পরীক্ষা ঃ দুনিয়ার সকল লোকের মুখে এ দাবি শুনা যায়– 'আমি একমাত্র আল্লাহকে দুনিয়া অপেক্ষা অধিক ভালবাসি।' তাহাদের এই দাবির পরীক্ষার জন্য একটি কষ্টিপাথর আছে। তাহা এই–কাহারও প্রবৃত্তি যখন তাঁহাকে কোন কাজের আদেশ করে কিন্তু এই আদেশ আল্লাহর আদেশের বিপরীতে হয় তখন তাঁহার মন যদি আল্লাহর আদেশের দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট হয় তবে বুঝা যাইবে যে, সে আল্লাহকে অধিক ভালবাসে। মনে কর, এক ব্যক্তি দুইজনকে ভালবাসে ; একজনকে বেশি, আর একজনকে কম। এই দুইজনের মধ্যে বিবাদ বাধিলে কাহাকে সে বেশি ভালবাসে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। সে যাহার পক্ষ অবলম্বন কর তাহাকে বেশি ভালবাসে। পক্ষ অবলম্বন না করিয়া কেবল মুখে ভালবাসি বলিলে কি লাভ? বস্তুত এইরূপ দাবি মিথ্যা। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যাহারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কালেমা পাঠ করে তাহারা যদি দুনিয়ার কার্য অপেক্ষা ধর্মের কার্যকে অধিক ভালবাসে তবে তাহারা আল্লাহর আযাব হইতে নিজদিগকে রক্ষা করে। কিন্তু যাহারা ইহার বিপরীত করে অর্থাৎ দুনিয়ার কাজকে দীনের কাজ অপেক্ষা অধিক ভালবাসে তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন ঃ "তোমাদের মিথ্যা বলিতেছ।" কারণ, দুনিয়াকে অধিক ভালবাসিয়া ইহার সহিত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা মিথ্যা।

www.BANGLAKITAB.com

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে জানিতে পারিয়াছ যে, কোন্ কোন্ ব্যক্তি কবর-আযাব হইতে অব্যাহতি পাইবে তাহা প্রকৃত চক্ষুষ্মান ব্যক্তি জানিতে পারেন। তাঁহারা আরও জানেন যে, বহু লোক এই আযাব হইতে অব্যাহতি পাইবে না। কিন্তু সংসারাসক্তির যেমন তারতম্য আছে–কাহারও অধিক, আবার কাহারও অল্প–তদ্রূপ এ আযাবের কাঠিন্য এবং সময়ের পরিমাণের মধ্যেও অনেক পার্থক্য আছে।

সংসারাসক্তির পরীক্ষা ঃ তুমি হয়ত বলিবে, কোন কোন নির্বোধ লোকে বলে, ইহাই যদি কবর-আযাব হয় তবে এজন্য আমরা মোটেও ভয় করি না। কারণ, সংসারের সহিত আমাদের কোনো সম্বন্ধই নাই। সংসার থাকুক বা না থাকুক, ইহাতে আমাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। নিজেদের পরীক্ষা না করিয়া এরূপ কথা বলা নিতান্ত অবাস্তব ও মূর্খতার পরিচায়ক বটে। যদি কাহারও যথাসর্বস্ব অপহৃত হয়, মান-সম্ভ্রম নষ্ট হয় ও ইহা তাহার প্রতিবেশী লাভ করে এবং মুরিদগণ তাহাকে পরিত্যাগ করত তাহার মনে কিছুমাত্র বিকার ও দুঃখ না জন্মে ; আর সে এমন নির্বিকার থাকে যেমন অপর কাহারও মান-সম্ভ্রম নষ্ট হইয়াছে এবং তাহার কোন ক্ষতিই হয় নাই তবে তাহার উক্তরূপ দাবি সত্য। 'দুনিয়া থাকুক আর না থাকুক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই' এ কথা বলা কেবল তখনই তাহার পক্ষে শোভা পায়। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার সমস্ত ধন অপহৃত না হয় এবং তাহার মুরিদগণ তাহাকে বর্জন না করে ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত প্রকার দাবি করার গুণ তাহার মধ্যে আছে কিনা, এ-বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই পরীক্ষার্থী প্রথম নিজ ধন– সম্পত্তি দূর করিয়া ও সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া যদি দেখিতে পায় যে, তাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও দুঃখ জন্মে নাই তখন তাহার ঐ গুণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করিবে। কারণ, অনেক বলিয়া থাকে স্ত্রী ও দাস-দাসীর সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ নাই, কিন্তু যখন সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে বা দাসীকে বিক্রয় করিয়া ফেলে তখন তাহার মনের গুপ্ত ভালবাসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় সে একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়ে।

কবর-আযাব হইতে অব্যাহতির উপায় ঃ যে ব্যক্তি কবর-আযাব হইতে অব্যাহতি পাইতে ইচ্ছা করে তাহার কর্তব্য, সংসারের প্রয়োজনীয় বস্তু আবশ্যক পরিমাণে ব্যবহারে রাখিয়া অতিরিক্ত যাবতীয় পদার্থ পরিত্যাগ করা। পায়খানায় যাওয়া আবশ্যক হইলেও তথায় বসিয়া থাকা কেহই পছন্দ করে না ; বরং কাজ সারিয়া শীঘ্র তথা হইতে বাহির হইয়া যাইতে ইচ্ছে করে। লোকে যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবল পেট খালি করিবার জন্য পায়খানায় যায় তদ্রূপ নির্লোভ হইয়া কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই আহার গ্রহণ করা উচিত। কারণ, এ দুইটি কাজই শুধু প্রয়োজনের তাগিদে করিতে হয়। দুনিয়ার যাবতীয় কাজ এইরূপ প্রয়োজনের তাগিদে করা আবশ্যক। মানুষ যদি স্বীয় মনকে দুনিয়ার সম্বন্ধ হইতে একেবারে মুক্ত করিতে না

পারে তবে অন্তত হৃদয়ে আল্লাহর ইবাদত ও যিকিরের প্রতি প্রবল আসক্তি উৎপাদন করা কর্তব্য এবং সর্বদা ইহাতেই লিপ্ত থাকা আবশ্যক। হৃদয় আল্লাহর ধ্যান-ধারণা এমন প্রবল করিয়া তোলা উচিত যাহাতে তাঁহার প্রতি মহব্বত দুনিয়ার সকল মহব্বতকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। ঐরূপ করিতে পারিলেও অহরহ স্বীয় প্রবৃত্তির গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং সর্বদা নিজের মনোভাব পরীক্ষা করিয়া দেখা মানুষের কর্তব্য। যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কার্যে সে ব্যক্তি শরীয়তের আদেশ অনুযায়ী চলে এবং প্রবৃত্তির প্ররোচনার উপর আল্লাহর আদেশ প্রবল করিয়া মানিতে সক্ষম তবে কবর–আযাব হইতে অব্যাহতি লাভের আশা থাকবে। পরীক্ষায় নিজের প্রবৃত্তিকে আল্লাহর আদেশের বশীভূত না পাইলে কবর- আযাব অবধারিত জানিবে। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ ক্ষমা করিলে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে।

আত্মিক দোযখ ঃ এখন আত্মিক দোযখের ব্যাখ্যা করিব। যে দোযখ-যন্ত্রণা আত্মার জন্যই নির্ধারিত, যাহা শরীর মোটেই ভোগ করিবে না ; তাহাকেই আমরা আত্মিক দোযখ বলিলাম। এই সম্বন্ধেই আল্লাহ বলেন ঃ যাহা প্রজ্বলিত করা হইয়াছে ; যাহা অন্তরসমূহ পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছিবে ইহাই আত্মার দোযখ ; ইহাই আত্মাকে বেষ্টন করিয়া লইবে। আর যে অগ্নি শরীর দগ্ধ করে তাহাকে শারীরিক দোযখ বলা হয়। এখন জানিয়া রাখ, আত্মিক দোযখে তিন প্রকার অগ্নি থাকে। প্রথম, দুনিয়ার লোভনীয় বস্তু হইতে বিচ্ছেদজনিত অগ্নি। দ্বিতীয়, অপমান প্রসূত লজ্জাজনিত অগ্নি। তৃতীয়, আল্লাহর চিরস্থায়ী অনুপম সৌন্দর্য দর্শনে বর্শিত ও নিরাশ হওয়ার ক্ষোভাগ্নি। এই ত্রিবিধ অগ্নি মানবের প্রাণের প্রাণ আত্মাকে দগ্ধ করে– দেহের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এই তিন প্রকার অগ্নির মূল কারণ দুনিয়া হইতেই লোকে সঙ্গে লইয়া যায়। ইহার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। এ জগত হইতে একটি দৃষ্টান্ত অবলম্বনে ব্যাখ্যা করিলে ইহার অর্থ ভালরূপে বুঝা যাইবে।

পার্থিব বস্তুর বিচ্ছেদজনিত অগ্নি ঃ ইহার মূল কারণ কবর আযাবের বর্ণনাকালে বলা হইয়াছে। মানুষ যতক্ষণ আপন প্রিয়তমের সহিত অবস্থান করে এবং তাহার প্রেমে আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে ততক্ষণ ইহাই তাহার পক্ষে আত্মিক বেহেশত আর বিচ্ছেদই দোযখ। এইরূপ সংসারাসক্ত ব্যক্তি যতকাল সংসারে থাকে ততকাল ইহাই তাহার বেহেশত। এই জন্যই হাদীসে আছে ঃ "দুনিয়া কাফিরদের বেহেশত।" দুনিয়া ছাড়িয়া পরকালে যাওয়া তাহাদের পক্ষে দোযখ। কারণ, তখন তাহাদের প্রিয়তম দুনিয়াকে ছিনাইয়া লওয়া হইবে। সুতরাং একই বস্তু অবস্থার পার্থক্যে কখনও সুখের কারণ হয়, আবার কখনও যন্ত্রণার মূল হইয়া থাকে।

www.BANGLAKITAB.com

দুনিয়াতে এই অগ্নির দৃষ্টান্ত এইরূপ–মনে কর, এমন এক বাদশাহ আছেন যাহার আজ্ঞাধীনে সমস্ত বিশ্ব পরিচালিত হয়। পরম রূপবতী রমণীগণের সহবাসে তিনি সর্বদা পরিতৃপ্ত আছেন, অগণিত দাস-দাসী তাঁহার সেবা করিয়া থাকে এবং যাবতীয় পার্থিব ভোগ-সুখে তিনি সর্বদা লিপ্ত থাকেন, আর পরম রমণীয় কানন– সুশোভিত রাজপ্রাসাদে তিনি অবস্থান করেন। অকস্মাৎ যদি কোন শত্রু আসিয়া বাদশাহকে বন্দী করত গোলাম বানায়, তাঁহার প্রজাদের সম্মুখে তাঁহাকে কুকুরের সেবায় বা অন্য নীচ কার্যে নিযুক্ত করে, তাঁহার সম্মুখে তাঁহার রমণীদিগকে নিজের উপভোগে নিযুক্ত করে এবং তাঁহার দাসদিগের কামনায় সমর্পণ করে এবং তাঁহার ধনাগারের মূল্যবান ধনরাশি তাঁহার শত্রুদের মধ্যে বিতরণ করে, তবে অনুধাবন কর, সেই বাদশাহের হৃদয় কেমন ভীষণ দাবানলে দগ্ধ হইতে থাকিবে। রাজত্ব, ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী ইত্যাদির বিচ্ছেদাগ্নি কিরূপ ভীষণভাবে তাঁহার মন–প্রাণকে দগ্ধ করিতে থাকিবে! এই যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি বলিতে থাকিবেন, আহা! লোকে যদি হঠাৎ এক আঘাতে আমাকে মারিয়া ফেলিত অথবা আমার শরীরে এমন কঠিন শাস্তি প্রদান করিত যাহাতে আমি এরূপ ভীষণ মানসিক যন্ত্রণা, এক প্রকার অগ্নি।

পার্থিব ধন-সম্পদ যত অধিক হইবে এবং রাজত্ব যত হইবে, বিচ্ছেদানলও ততই কঠিন ও তীব্র হইবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যে পরিমাণে সুখভোগ করিবে ও যে পরিমাণে সফলকাম হইবে, দুনিয়ার প্রতি তাহার আসক্তি সেই পরিমাণে প্রবল হইয়া উঠিবে এবং তাহার বিচ্ছেদানলও সেই পরিমাণে কঠিন ও তীব্র হইবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই অগ্নির তীব্রতা বুঝাইয়া দেওয়া এ সংসারে অসম্ভব ; কারণ, দুনিয়াতে মানসিক যন্ত্রণা পূর্ণভাবে স্থায়ী থাকে না ; এই জন্যই পীড়িত ব্যক্তি যখন স্বীয় চক্ষুকর্ণ কোন বিষয়ে ব্যাপৃত রাখে তখন তাহার পীড়ার যন্ত্রণা অনেক কমিয়া যায়। তৎপর সেই ব্যাপৃতি ছুটিয়া গেলে পীড়ার যন্ত্রণা আবার প্রবল হইয়া উঠে। এই একই কারণে বিপদগ্রস্ত লোক নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে তাহার হৃদয়ে যন্ত্রণা পূর্ব হইতে অত্যধিক হইয়া থাকে। ইহা এইজন্যই হয় যে, নিদ্রা মানব-হৃদয়কে পার্থিব কার্য-ব্যাপৃতির পঙ্কিলতা ও ইন্দ্রিয়ের পূর্বসঞ্চিত খেয়াল হইতে পরিষ্কার করে। পুনর্বার জড়-জগতের দিকে মন ব্যাপৃত হইবার পূর্বে ঐ পরিষ্কার মনে যাহা পড়ে তাহার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে। নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়ামাত্র খোশ আওয়াজ শুনিলে খুব সুন্দর লাগে। জড়-জগতের প্রভাব হইতে মন মুক্ত হওয়ার কারণেই মনের উপর উক্ত প্রভাবের তীব্রতা ঘটিয়া থাকে। এ জগতে জড়বস্তুর প্রভাব হইতে মন একেবারে মুক্ত হইতে পারে না। মৃত্যু ঘটিলে ইহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। তখন হৃদয়ে অপরিসীম শান্তি বা যন্ত্রণা স্থায়ী হয়। দোযখের অগ্নিকে দুনিয়ার অগ্নিতুল্য মনে করিও না। বরং দোযখের অগ্নিকে সত্তর বার পানিতে ধৌত করিয়া দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে।

অপমানপ্রসূত লজ্জাজনিত অগ্নি ঃ ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ–মনে কর, এক বাদশাহ এক নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সম্মান দান করত স্বীয় রাজ্যে আপন প্রতিনিধি বানাইলেন– শাহী অন্তঃপুরেও তাহাকে যাতায়াতের অনুমতি দিলেন যেন কেহই তাহার নিকট পর্দার অন্তরালে না থাকে, ধনাগারের সমস্ত ক্ষমতা তাহার উপর ছাড়িয়া দিলেন এবং সকল কার্যের ভার দিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। এরূপ ক্ষমতা লাভ করিয়া সে ব্যক্তি প্রকাশ্যে বাদশাহের আনুগত্য দেখাইতে লাগিল বটে, কিন্তু মনেপ্রাণে তাঁহার অবাধ্য হইয়া উঠিল। ধনাগারের ধন আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিল, শাহী অন্তঃপুরেও অসদাচরণ ও গোলযোগ করিতে লাগিল ; অথচ প্রকাশ্যে বাদশাহের নিকট আপন সততা ও বিশ্বস্ততা দেখাইতেছিল। অন্তঃপুরে অপকর্ম করিবার কালে সে একদিন দেখিল যে, বাদশাহ কোন ছিদ্র দিয়া তাহাকে দেখিতেছেন এবং ভাবিল যে, তাহার ঐরূপ দুষ্কর্ম বাদশাহ সর্বদাই দেখিতেছেন ; কিন্তু তাহার দুষ্কর্ম আরও বৃদ্ধি পাইলে একদিন হঠাৎ তাহাকে ধরিয়া কঠিন দণ্ড দানে বিনাশ করিয়া ফেলিবেন, এইজন্যই তিনি উহা সহ্য করিয়া আসিতেছেন। এখন ভাবিয়া দেখ, সেই সময় তাহার মনে কেমন অপমান ও লজ্জার অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে। তখন সে কি দৈহিক শাস্তি পাবে? বরং সেই সময় ভয় ও লজ্জার ভীষণ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় সে ভূগর্ভে লুকাইবার ইচ্ছা করিবে।

তুমিও দুনিয়াতে অভ্যাসবশত সেইরূপ কত কার্য করিতেছ যাহা ভাল বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু ইহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থা নিতান্ত কদর্য ও ঘৃণিত। কিয়ামত-দিবস যখন এই সকল কার্যের প্রকৃত রূপ তোমার নিকট প্রকাশ পাইবে তখন তুমি লজ্জা ও অনুতাপে দগ্ধ হইতে থাকিবে। মনে কর, তুমি অদ্য অগোচরে পরনিন্দা (গীবত) করিলে। পরকালে তুমি দেখিতে পাইবে যেন তুমি সুপক্ক মোরগ-গোশত ভ্রমে স্বীয় মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করিতেছে। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিবে যে, তুমি তোমার মৃত ভ্রাতার পঁচা গোশত ভক্ষণ করিতেছ, ভাবিয়া দেখ, তখন তুমি কিরূপ লজ্জিত হইবে এবং কিরূপ তীব্র দাবানল তোমার হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকিবে। ইহাই গীবতের প্রকৃত অবস্থা। এখন গীবতের প্রকৃত অবস্থা তোমার নিকট গুপ্ত আছে বটে, কিন্তু পরকালে ইহা স্বীয় আকারে প্রকাশ পাইবে। এজন্য স্বপ্নে কেহ মৃত ব্যক্তির গোশত ভক্ষণ করিলে ইহার অর্থ এই যে, সে গীবত করে। তুমি যদি প্রাচীরে প্রস্তর নিক্ষেপ কর, আর কেহ সংবাদ দেয় যে, সেই প্রস্তরে তোমার গৃহে পড়িয়া তোমার সন্তানদের চক্ষু নষ্ট করিতেছে এবং তুমিও গৃহে গিয়া দেখিলে যে তোমার নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড তোমার প্রাণাধিক সন্তানদিগের চক্ষু নষ্ট করিয়াছে তবে একমাত্র তুমিই জান, তোমার হৃদয়ে কেমন প্রচণ্ড অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে এবং তুমি কিরূপ অনুতপ্ত হইবে।

www.BANGLAKITAB.com

এ জগতে কেহ কাহাকে হিংসা করিলে পরকালে হিংসুক ইহার প্রকৃত রূপ নিজের মধ্যে দেখিতে পাইবে। হিংসার অর্থ অনিষ্ট কামনা করা। কিন্তু যাহাকে হিংসা করা হয় তাহার কোন ক্ষতি হয় না ; বরং সে-ক্ষতি হিংসুকের দিকেই ফিরিয়া আসে ও তাহার ধর্ম নষ্ট হয় এবং পরকালে যে ইবাদত তাহার চক্ষের জ্যোতি হইত তাহা ফেরেশতাগণ তাহার আমলনামা হইতে উঠাইয়া যাহাকে হিংসা করা হয় তাহার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়া থাকেন। এইরূপে হিংসুক পুণ্যহীন হইয়া পড়ে। সংসারে তোমার সন্তানের চক্ষু তোমার যেরূপ উপকারে আসিবে পরকালে তোমার পুণ্য ততোধিক উপকারে লাগিবে। কারণ, পুণ্য তোমার সৌভাগ্যের উপকালে তোমার পুণ্য ততোধিক উপকারে লাগিবে। কারণ, পুণ্য তোমার সৌভাগ্যের উপকরণ নহে। পরকালে প্রত্যেক বস্তুর আকার প্রকৃতি অনুযায়ী হইবে। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি তখন তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী দেখা যাইবে। আর তখন কার্যের প্রকৃতি অনুযায়ী অপমান ও অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে। নিদ্রা পরকালের কিছুটা নিকটবর্তী বলিয়া প্রত্যেক কার্যের আসল রূপ নিদ্রিতাবস্থায় স্বীয় আকারে দেখা যায়। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে সিরীন (রা)-এর নিকট গিয়া বলিল, "আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমার হাতের আংটি দ্বারা পুরুষগণের মুখে স্ত্রীলোকগণের লজ্জাস্থানে মোহর করিতেছি।" দিয়া থাক। সে ব্যক্তি বলিল ঃ 'বাস্তবিক তাহাই বটে।" ভাবিয়া দেখ, স্বপ্নদর্শকের কার্যের প্রকৃত অবস্থা স্বপ্নে কেমন সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। রমযান মাসের আযান সেহরীর সময় অবসানের সতর্কবাণী ও আল্লাহর যিকিরস্বরূপ। ইহার প্রকৃত অবস্থা আহার ও স্ত্রী-সহবাসে নিষেধ জ্ঞাপক। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, পারলৌকিক অবস্থার নমুনা তোমাকে স্বপ্নে দেখানো হইতেছে ; অথচ তুমি এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ; এই মর্মেই হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, কিয়ামত দিবসে দুনিয়াকে একটা কদাকার বুড়ির আকারে উপস্থিত করা হইবে। লোকে তাহাকে দেখিয়া বলিবে, "হে আল্লাহ আমাদিগকে ইহা হইতে রক্ষা কর।" ফেরেশতাগণ বলিবেন ঃ "ইহাই দুনিয়া যাহার পিছনে তোমরা জান-প্রাণ দিতে।" সেই সময় মানুষ এমন অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইবে যে, উহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিবে।

এই অনুতাপ ও লজ্জা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প বলা যাইতেছে। এক বাদশাহ তাহার পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। বাদশাহ তনয় যে রজনীতে আপন প্রেয়সীর সহিত মিলিত হইবেন সেই দিনি অন্তঃপুরে প্রবেশের পূর্বে অপরিমিত মদ্য পান করিলেন। উন্মত্তাবস্থায় নববধুর অন্বেষণে বাহির হইয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিলেন। কিন্তু পথ ভুলিয়া তিনি গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। চলিতে চলিতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, একটি গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছে। তিনি ইহাকেই

নববধুর শয়নগৃহ বলিয়া মনে করিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া কতক লোককে শায়িত দেখিতে পাইলেন, অনেকবার তাহাদিগকে ডাকিলেন, কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিল না। মনে করিলেন সকলেই নিদ্রিত আছে। ইহাদের মধ্যে একজনকে নূতন চাদরে আবৃত দেখিয়া তাহাকে নববধূ বলিয়া মনে করিলেন। তাহার পার্শ্বে শয়ন করিলেন। তাহার উপর হইতে চাদর সরাইয়া দিলেন ; তখন এক প্রকার সুগন্ধি তাঁহার নাসিকায় পৌঁছিল। ভাবিলেন, অবশ্যই এ নববধূ সুগন্ধি ব্যবহার করত শয়ন করিয়াছেন। তাহার সহিত সহবাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। ইহাতে এক প্রকার রস বাহির হইলে তিনি মনে করিলেন নববধূ তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করত গোলাপ ছিটাইতেছেন। এইরূপে প্রভাত হইল এবং বাদশাহ-তনয়ের নেশা ছুটিল। তখন দেখিতে পাইলেন যে, ঐ গৃহ অগ্নি উপাসকদের সমাধিস্থল। পূর্বে যাহাদিগকে নিদ্রিত মনে করিয়াছিলেন তাহারা মৃতদেহ। যাহাকে নূতন চাদরে আবৃত দেখিয়া নববধু মনে করিয়াছিলেন সে একটি বীভৎস আকৃতির কদাকার বৃদ্ধা–দুই চারি দিন হইল মরিয়াছে। কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য মৃতার দেহে মর্দন করা হইয়াছিল, তাহা হইতেই বাদশাহ-তনয় সেই গন্ধ পাইয়াছিলেন। সেই রস বা আর্দ্রতা ঐ বৃদ্ধার মলমূত্র ও পঁচা গলিত পদার্থ ছিল। তিনি দেখিতে পাইলেন তাঁহার সমস্ত দেহ বৃদ্ধার মলমূত্র, গলিত রক্ত-পূঁজে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধার মুখের গলিত পুঁজে তাঁহার মুখ কটু বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ঘৃণা ও অনুতাপে তাঁহার মন একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার এই দুরবস্থা কেহ দেখিতে না পায়, বিশেষত বাদশাহ অর্থাৎ তাঁহার পিতা ও সৈন্য-সামন্ত তাঁহার দুর্গতি জানিতে না পারে এইজন্য তিনি মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন। বাদশাহ-তনয় এমন ভয় ও অনুশোচনায় আচ্ছন্ন ছিলেন, এমন সময় বাদশাহ সভাসদ ও সৈন্যসামন্তসহ পুত্রের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় পুত্রের দুর্গতি দেখিতে পাইলেন। তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিলেন এবং সেই দুর্গতি ও লজ্জার হাত এড়াইবার জন্য ভূগর্ত বিদীর্ণ হইলে প্রোথিত হইবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। পার্থিব আনন্দ ও লোভনীয় বস্তু লইয়া যে সকল দুনিয়াদার এ জগতে মত্ত থাকে পরকালে তাহাদেরও এরূপ দুর্গতিই হইবে। সংসারের লোভনীয় বস্তুতে নিমজ্জিত থাকার দরুন তাহাদের মনের উপর যে প্রভাব থাকিবে তাহা বাদশাহ্ তনয়ের দেহে মিশ্রিত মল-মূত্র, পুঁজ ও তাঁহার মুখের বিস্বাদেয় ন্যায় হইবে। বরং তাহাদিগকে বাদশাহ-তনয় অপেক্ষা অধিক অপমানিত হইবে হইবে এবং তাহারা সহস্র গুণে অধিক যাতনায় নিপতিত হইবে। কারণ, পরকালের শাস্তি ও কষ্টের সহিত দুনিয়ার শাস্তি ও কষ্টের কোন তুলনাই হইতে পারে না। উক্ত গল্পে যে অগ্নির কথা বর্ণিত হইল শরীরের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই ইহা কেবল আত্মাকে দগ্ধ করে। ইহাকে লজ্জা ও অনুতাপের অগ্নি বলে।

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর সৌন্দর্য-দর্শনে বঞ্চিত থাকার ক্ষোভাগ্নি ঃ এ দুনিয়া হইতে লোকে যে দর্শনহীনতা ও অজ্ঞানতা লইয়া যাইবে তাহাই এই অগ্নির কারণ, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ জগতে আল্লাহর মারিফাত লাভ করে নাই এবং শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা নিজ আত্মাকে পরিষ্কার করে নাই, অধিকন্তু পাপের মলিনতা ও সংসারাসক্তির মরিচা দ্বারা ইহাকে কলুষিত করিয়াছে, তাহার হৃদয়ে পরকালে আল্লাহর অনুপম সৌন্দর্য প্রতিফলিত হইবে না। তাই আল্লাহর সৌন্দর্য দর্শনে বঞ্চিত থাকার দরুণ তাহারা ক্ষোভানলে দগ্ধ হইতে থাকিবে। এই অনলের দৃষ্টান্ত এইরূপ ঃ মনে কর, অন্ধকার রজনীতে তুমি একদল লোকের সহিত কোন স্থানে উপস্থিত হইলে ; তথায় অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। তুমি ইহাদের বর্ণ দেখিতেছ না। তোমার সঙ্গী তোমাকে বলিল, "যত পার, প্রস্তরখণ্ড কুড়াইয়া লও। আমি শুনিয়াছি এই সকল প্রস্তরে অনেক উপকার হয়।" সঙ্গের লোক যে যত পারিল লইতে লাগিল। কিন্তু তুমি একটিও লইলে না। তুমি বলিলে, শুধু প্রস্তরের বোঝা বহন করা নিরেট মূর্খের কাজ। একমাত্র আল্লাহ্ জানেন, এ সকল কোন কার্যে আসিবে কিনা। তোমার সঙ্গিগণ কিন্তু সকলেই বোঝা বাঁধিয়া লইয়া চলিল। তুমি খালি হাতে তাহাদের সঙ্গে চলিলে এবং তাহারা বোঝা বহন করিতেছে দেখিয়া তাহাদিগকে উপহাসও করিতে লাগিলে। আর তাহাদিগকে বোকা মনে করত আফসোস করিয়া বলিতে লাগিলে, যাহার কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে, সে আমার ন্যায় শূন্যহস্তে আরামে গমন করে, যে নির্বোধ সেই গাধার মত অসার লোভে বোঝা বহিয়া মরে। পরে তাহারা আসিয়া দেখিতে পাইল, ঐ সকল প্রস্তরখণ্ডের প্রত্যেকটি লাবণ্যময় মহারত্ন ; এক একটি রত্নের মূল্য লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। যাহারা প্রস্তরখণ্ডের বোঝা বহিয়া আনিয়াছিল তাহারা আরও অধিক আনে নাই বলিয়া দুঃখ করিতে থাকিবে। ধোঁকায় পড়িয়া তুমি আনয়ন কর নাই বলিয়া মর্মান্তিক যাতনায় তিলে তিলে ধ্বংস হইবে এবং ক্ষোভের প্রচণ্ড অগ্নি তোমার প্রাণ দগ্ধ করিতে থাকিবে। তোমার সঙ্গিগণ উক্ত রত্নের বিনিময়ে দুনিয়ার রাজত্ব লাভ করিবে, ইচ্ছানুরূপ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিবে এবং মনোরম প্রাসাদে বাস করিতে থাকিবে। অপরদিকে তাহারা তোমাকে উলঙ্গ ও অনাহারে রাখিবে এবং গোলাম বানাইয়া তাহাদের কার্যে নিযুক্ত করিবে। তাহাদের নিকট তুমি কিছু চাহিলে তাহারা অগ্রাহ্য করিবে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন ঃ

اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ـ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ "(দোযখবাসিগণ বেহেশতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে,) আমাদের দিকে কিছু পানি বহাইয়া দাও অথবা আল্লাহ তোমাদিগকে যে জীবিকা দান করিয়াছেন তাহা হইতে আমাদিগকে কিছু দান কর। বেহেশতবাসিগণ বলিবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ

এই দুই বস্তু তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন।" বেহেশতবাসিগণ আরও বলিবে, "দুনিয়াতে তোমরা আমাদিগকে নির্বোধ জ্ঞানে উপহাস করিতে ; এখন আমরা তোমাদিগকে উপহাস করিতেছি।" এই মর্মে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ـ

অর্থাৎ "যদি তোমরা আমদিগকে উপহাস কর তবে নিশ্চয়ই আমরাও তোমাদিগকে উপহাস করিব যেমন তোমরা উপহাস করিতেছ।" তোমার সেই মহারত্ন হইতে বঞ্চিত হওয়ায় দুঃখ বেহেশতের অসীম নিয়ামত ও আল্লাহর অনুপম সৌন্দর্য-দর্শনে বঞ্চিত হইবার দুঃখের অনুরূপ। যাহারা দুনিয়া হইতে পুণ্যরূপ মহারত্ন সঞ্চয়ের কষ্ট স্বীকার করে না এবং বলে, "ভবিষ্যতের অনিশ্চিত অবস্থার জন্য বর্তমানের উপস্থিত সুখ ত্যাগ করিয়া কেন কষ্ট ভোগ করিব?' তাহারাই পরকালে চীৎকার করিয়া বলিবে, "আমাদের দিকে কিছু পানি বহাইয়া দাও।" তাহাদের মনস্তাপ হইবে না কেন? কারণ, পরকালে আরিফ ও আবিদগণ যে-সকল উপাদেয় বস্তু উপভোগ করিতে পাইবেন এবং যেরূপ সৌভাগ্য লাভ করিবেন, দুনিয়ার দীর্ঘ জীবন-ব্যাপী সুখ-সৌভাগ্য ইহার এক মুহূর্তের সুখ-সৌভাগ্যের তুল্যও হইবে না। এমনকি, যে ব্যক্তি দোযখ হইতে সর্বশেষে অব্যাহতি পাইবে তাহাকে দুনিয়ার সুখ-সৌভাগ্যের দশগুণ দেওয়া হইবে। সুখ-সৌভাগ্যের এই তুলনা দুনিয়ার পরিমাণ ও ওজনের সহিত নহে ; বরং সুখাস্বাদজনিত আনন্দের মাত্রার সহিতই এই তুলনা করা হইয়া থাকে। ইহা এইরূপ, যেমন মনে কর, বলা হইল–একটি মুক্তা দশটি স্বর্ণমুদ্রার তুল্য। ইহাতে এ কথা বুঝা যায় না যে, একটি মুক্তার পরিমাণ বা ওজন দশটি স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ বা ওজনের সমান ; বরং ইহাই বুঝায় যে, একটি মুক্তার মূল্য দশটি স্বর্ণমুদ্রার মূল্যের সমান।

শারীরিক অগ্নি হইতে মানসিক অগ্নি তীব্রতর ঃ উপরে তিন প্রকার মানসিক অগ্নির বিবরণ দেওয়া হইল। ইহা হইতে জানা গেল যে, মানসিক অগ্নি শারীরিক অগ্নি হইতে বহুগুণে তীব্রতর। কারণ, কষ্ট যন্ত্রণা প্রাণ পর্যন্ত প্রবেশ না করিলে শরীরে তাহা অনুভূতই হয় না। সুতরাং বুঝা যায়, শারীরিক কষ্ট প্রাণে প্রবেশ করিয়া তীব্রতর হইয়া উঠে। কাজেই যে অগ্নি প্রাণের ভিতর প্রজ্বলিত হইয়া বাহিরে আসে তাহা যে অগ্নি শরীরে লাগে তাহা হইতে স্বভাবতই তীব্রতর হইয়া থাকে। উক্ত তিন প্রকার অগ্নি প্রাণের ভিতরে প্রজ্বলিত হয়– বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করে না।

প্রকৃতির বিপরীত কোন কিছু যদি কাহারও উপর প্রবল হইয়া উঠে তবে ইহাও তাহার কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। শারীরিক গঠন প্রণালী যাহাতে অক্ষত থাকে এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাহাতে স্বাভাবিকমত পরস্পর সংলগ্ন থাকে, তাহাই শরীরের

www.BANGLAKITAB.com

প্রকৃতি চায়। কোন আঘাতে এক অঙ্গকে অন্য অঙ্গ হইতে পৃথক করিলে শারীরিক প্রকৃতির বিপরীত ঘটনা ঘটে এবং শরীরে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। আঘাত যেমন এক অঙ্গকে অপর অঙ্গ হইতে পৃথক করিয়া দেয় তদ্রূপ অগ্নিও সমস্ত অঙ্গকে পরস্পর পৃথক করিয়া দিয়া থাকে ; সুতরাং সকল অঙ্গেই যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এইজন্যই অগ্নির যন্ত্রণা অতীব কঠিন। এইরূপ হৃদয়ে যখন ইহার বিপরীত পদার্থ আসিয়া চাপে তখন প্রাণে মহা যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। আল্লাহর দীদার ও তাঁহার পরিচয় লাভ করাই মানবাত্মার স্বাভাবিক প্রকৃতি। আল্লাহর দীদার লাভে বঞ্চিত থাকা ইহার স্বভাববিরুদ্ধ। সুতরাং ইহা হইতে বঞ্চিত থাকিলে হৃদয়ে অসীম যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। মানবাত্মা পীড়িত না হইলে এ জগতেই আল্লাহর দীদারে বঞ্চিত থাকার দরুন তাহাকে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। দেহ, হস্ত-পদ পীড়িত হইয়া অবশ হইয়া পড়িলে উহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেও যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। আবার পীড়া দূর হইলে শরীরে আগুনের স্পর্শ লাগামাত্রই ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে। সেইরূপ মানবাত্মা দুনিয়ার মোহ-পীড়ায় অসাড় থাকে। মৃত্যু হইলে সেই অসাড়তা দূরীভূত হয় এবং তখন অকস্মাৎ অন্তর্নিহিত অগ্নি পূর্ণভাবে হৃদয়ে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই অগ্নি বাহিরের কোথাও হইতে আসে না। কারণ এ-জগত হইতেই লোকে ইহা সঙ্গে লইয়া যায় এবং ইহা আত্মার সহিতই থাকে। নিশ্চিত জ্ঞান না থাকার কারণে এই অগ্নি এ জগতে বুঝা যায় না। এখন প্রত্যক্ষ দর্শনে নিশ্চিত-জ্ঞান হইলে ইহা পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইল। এই মর্মেই আল্লাহ বলেন ঃ

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ - لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ -

অর্থাৎ "তোমাদের যদি নিশ্চিত জ্ঞান থাকিত তবে তোমরা দোযখের প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিতে পাইতে।"

শরীয়তে শারীরিক বেহেশত-দোযখের অধিক বর্ণনার কারণ ঃ শরীয়তে শারীরিক বেহেশত-দোযখের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। কারণ, উহা সকলেই জানিতে পারে ও বুঝে। কিন্তু আত্মিক বেহেশত ও দোযখের শ্রেষ্ঠত্ব ও কষ্ট সকলে বুঝিতে না পারিয়া তুচ্ছ জ্ঞানে উপেক্ষা করিবে বলিয়া স্পষ্টভাবে উহার বর্ণনা করা হয় নাই। যদি তুমি কোন বালককে বল, "লেখাপড়া কর ; না করিলে প্রভুত্ব ও তোমার পিতার ঐশ্বর্য পাইবে না ; সুতরাং মহা সৌভাগ্য হইতে তুমি বঞ্চিত হইবে।" তবে বালক এ-কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিবে না এবং ইহার বিশেষ কোন প্রভাব তাহার হৃদয়ে পড়িবে না। কিন্তু বালককে যদি বল, "না পড়িলে তোমার শিক্ষক তোমাকে কানমলা দিবেন", তবে সে ভয় করিব ; কারণ ইহা সে বুঝিতে পারিবে। যে-বালক লেখাপড়া করে না তাহার সম্বন্ধ শিক্ষকের শাস্তি সত্য এবং পিতার ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত হওয়াও সত্য। এইরূপ শারীরিক দোযখও সত্য এবং আল্লাহর দীদার হইতে

বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভাগ্নিও সত্য। পিতার অতুল ঐশ্বর্য ও প্রভুত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়ার তুলনায় শিক্ষকের প্রহার যেমন নিতান্ত তুচ্ছ তদ্রূপ আত্মিক দোযখের তুলনায় শারীরিক দোযখ কিছুই নহে।

তুমি হয়ত বলিবে, বেহেশত-দোযখ সম্বন্ধে এ গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইল তাহা শরীয়তের আলিমগণ যাহা বলিয়াছেন এবং কিতাবাদিতে লিখিয়াছেন তাহার বিপরীত। কারণ তাঁহারা বলেন, "কেবল অনুবর্তী বিশ্বাস (তকলীদ) ও অন্যের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া বেহেশত-দোযখ সম্বন্ধে জানা যাইতে পারে ; উহা বুঝিতে বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক দর্শন ক্ষমতার কিছুমাত্র অধিকার নাই। ইহার উত্তর শোন, শরীয়তের অলিমগণের মত যে আমাদের মতের বিপরীত নহে, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কারণ, আখিরাত সম্বন্ধে তাহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাও ঠিক। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি জড়জগতেই সীমাবদ্ধ ; আধ্যাত্মিক জগতের পরিচয় তাঁহারা লাভ করেন নাই ; অথবা পরিচয় পাইয়া থাকিলেও বর্ণনা করেন নাই। কারণ, অধিকাংশ লোকে তাহা বুঝিবে না।

আধ্যাত্মিক জগত ঃ যাহা শরীর ও জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহা শরীয়তের আলিমগণের নিকট না শুনিলে এবং তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিলে বুঝা যায় না। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান আত্মার স্বরূপ দর্শনের একটি শাখা। ইহা জানিবার অপর একটি স্বতন্ত্র পথও রহিয়াছে ; এ পথে গুপ্ত বিষয় জানা ও দেখা যায়। যে ব্যক্তি আপনার বাসস্থান পরিত্যাগপূর্বক ধর্মপথের পথিক হইয়াছেন এবং কখনও স্বীয় বাসস্থানে অবস্থান করেন না, কেবল তিনিই এই পথ পাইয়াছেন। এখানে বাসস্থানের অর্থ কোন কোন নগর বা গৃহ নহে। কারণ, নগর বা গৃহ শরীরের বাসস্থান এবং এক্ষেত্রে শারীরিক ভ্রমণের কোন মূল্য নাই। কিন্তু মানুষের মূল আত্মারও একটি বাসস্থান আছে ; অর্থাৎ আত্মা যেখান হইতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে ইহাই তাহার বাসস্থান। তথা হইতে সে মুসাফিরের ন্যায় এখানে আসিয়াছে। তাহার পথে বহু মঞ্জিল রহিয়াছে। প্রত্যেকটি মঞ্জিল এক একটি স্বতন্ত্র জগত। প্রথম মঞ্জিল জড় জগত, দ্বিতীয় মঞ্জিল চিন্তা-জগত, তৃতীয় মঞ্জিল কল্পনা জগত এবং চতুর্থ মঞ্জিল বুদ্ধি-জগত। চতুর্থ মঞ্জিলে উপস্থিত হইলে মানুষ স্বীয় আত্মার পরিচয় লাভ করে। ইহার পূর্বে সে এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারে না।

একটি দৃষ্টান্ত সেই চারি জগতের বিষয় বুঝা যাইবে। মানুষ যতদিন জড়-জগতে আবদ্ধ থাকে ততদিন তাহাদিগকে পতঙ্গের সহিত তুলনা করা চলে। প্রদীপ দেখামাত্র পতঙ্গ ইহাতে পতিত হয়। কারণ, ইহার দর্শন-শক্তি আছে, কিন্তু চিন্তা ও স্মরণশক্তি নাই। অন্ধকার হইতে পলায়ন করিবার জন্য পতঙ্গ ছিদ্রপথ তালাশ করে। প্রদীপকে পালাইবার পথ মনে করিয়া ইহাতে পতিত হয়। একবার প্রক্রিয়া অগ্নির উত্তাপ ও কষ্ট পাইলেও উহা তাহার মনে থাকে না। কারণ, পতঙ্গের স্মরণশক্তি ও চিন্তা করিবার

www.BANGLAKITAB.com

ক্ষমতা মোটেই নাই এবং ইহারা স্মরণ ও চিন্তাশক্তি লাভের উপযুক্তই নহে। এই জন্যই বারবার আপনাকে প্রদীপে ফেলিয়া স্বীয় জীবন বিনাশ করে । পতঙ্গের স্মরণ ও চিন্তাশক্তি থাকিলে একবার অগ্নির উত্তাপ ও কষ্ট ভোগ করিয়া আবার কখনও প্রদীপের ত্রিসীমায় যাইত। কারণ, পশু একবার প্রহার ভোগ করিলে ইহা তাহার স্মরণ থাকে এবং পুনরায় লাঠি দেখামাত্রই পলায়ন করে। মানুষও যতদিন প্রথম মঞ্জিল জড়জগতে আবদ্ধ থাকে ততদিন পতঙ্গ সদৃশ থাকে। দ্বিতীয় মঞ্জিল চিন্তা-জগতে উপনীত হইলে মানুষকে পশুর সহিত তুলনা করা যায়। কারণ, অজ্ঞতার দরুণ পশু প্রথমে কষ্টদায়ক বস্তু হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে পারে না বটে কিন্তু একবার যাহা হইতে কষ্ট প্রাপ্ত হয় দ্বিতীয়বার তাহা দেখিলেই পলায়ন করে ; তৃতীয় মঞ্জিল, কল্পনা-জগতে উপস্থিত হইলে মানুষ ছাগল ও ঘোড়ার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শত্রু দ্বারা কষ্ট পাইবার পূর্বেই ইহারা শত্রুর স্বাভাবিক জ্ঞানে চিনিয়া তাহা হইতে পলায়ন করে। এইজন্যই যে ছাগল পূর্বে কখনও নেকড়ে বাঘ দেখে নাই সে ও তাহা হইতে পলায়ন করে ; তদ্রূপ যে অশ্ব পূর্বে কোন দিনই ব্যাঘ্র দেখে নাই সেও শত্রুজ্ঞানে তাহা হইতে পলায়ন করে। অথচ বলদ, উট, হাতী আকারে নেকড়ে বাঘ ও ব্যাঘ্র অপেক্ষা অনেক বড় হইলেও ইহাদিগকে দেখিয়া ছাগল ও অশ্ব পলায়ন করে না। এইরূপ বুদ্ধি আল্লাহ ছাগল ও অশ্বকে দান করিয়াছেন কিন্তু আগামীকল্য কি ঘটিবে ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। চতুর্থ মঞ্জিলে উপনীত হইলে এই জ্ঞান লাভ হয়। চতুর্থ মঞ্জিল হইল বুদ্ধি-জগত। ইহাতে উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ পশুর পর্যায়ে থাকে। এই মঞ্জিলে উপস্থিত হইলে মানুষ পশুর সীমা অতিক্রম করে। বাস্তবপক্ষে সে তখন মনুষ্যত্বের প্রথম সোপানে পদার্পণ করে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে এমন বিষয় জানা যায় যাহার উপর স্পর্শ চিন্তা ও কল্পনার কোন অধিকার নাই। ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা এ অবস্থায় জানিতে পারিয়া ভয়ে পরিত্যাগ করা চলে। কোন বস্তু যাহা আকৃতিতে যেরূপ দেখায় তাহা হইতে ইহার বাস্তব রূপ পৃথক করা যায় এবং প্রত্যেক বস্তুর বাহ্য আকৃতি দর্শনে ইহার হাকীকত বুঝা যায়। এ জগতে যত পদার্থ দেখা যায় উহা অসীম নহে। কারণ, জড় জগতের পদার্থের অবয়ব ও আকার আছে এবং যাহার অবয়ব আছে তাহার সীমাও আছে। স্থলপথে চলাচল করা যেমন সহজ জড় জগতের বিষয় চিন্তা করাও তদ্রূপ সহজ ; সুতরাং সকলেই ইহা করিতে পারে। কিন্তু চতুর্থ মঞ্জিল অর্থাৎ বুদ্ধির জগত যাহা শুধু আত্মা ও কর্মের প্রকৃত অবস্থা লইয়া ঘটে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ পানির উপর দিয়া গমনাগমনতুল্য কঠিন। তৃতীয় মঞ্জিল অর্থাৎ কল্পনা-জগতে পরিভ্রমণ করা নৌকাপথে ভ্রমণতুল্য– পানি ও স্থলের মধ্যবর্তী। চতুর্থ মঞ্জিলের শেষভাগে অর্থাৎ বুদ্ধি–জগতের পরপারে এমন এক উন্নত সোপান আছে যাহাতে একমাত্র আম্বিয়া আওলিয়া ও সূফীগণ অবস্থান করেন। এই উন্নত সোপানে

বিচরণ বায়ুর উপর গমনাগমনতুল্য। কতক লোকে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "হ্যাঁ, তাঁহার বিশ্বাস তদপেক্ষা বৃদ্ধি পাইলে তিনি নিশ্চয়ই বাতাসের উপর দিয়া চলিতেন।"

মানুষের পক্ষে সর্বোন্নত পদ-প্রাপ্তির আশা ও নিম্নতম স্থানে পতনের ভয় ঃ মানুষের গন্তব্যপথের মঞ্জিলসমূহ জ্ঞান-পথের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ ইহার শেষ মঞ্জিলে উন্নীত হইলে ফেরেশতার মরতবা লাভ করে। সুতরাং ইতর প্রাণীর নিম্নতম পর্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ফেরেশতাগণের সর্বোন্নত পর্যায় পর্যন্ত মানুষের গন্তব্যপথ বিস্তৃত রহিয়াছে। উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ ও অবনতির নিম্নতম কূপে পতন তাহার কর্মের উপর নির্ভর করে। তাই তাহার পক্ষে সর্বোন্নত পদ-প্রাপ্তির আশা ও নিম্নতম কূপে পতনের ভয় রহিয়াছে। এই আশঙ্কাজনক অবস্থার বিষয় পবিত্র কুরআন শরীফে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ (الى قوله) كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি আমানত (গুরুতর কর্তব্যভার) আসমান, যমীন ও পর্বতসমূহের সম্মুখে পেশ করিলাম ; অনন্তর সকলেই উহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহা দেখিয়া ভীত হইল এবং কেবল মানব-জাতি উহা বহনের জন্য উঠাইয়া লইল। নিশ্চয়ই মানুষ নিজের উপর অত্যন্ত অত্যাচারী ও নিতান্ত মূর্খ।" (সূরা– আহযাব, রুকু ৯, পারা ২২) মানুষের এই গুরু-দায়িত্বভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করার কারণ এই যে, প্রস্তরাদির অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না, কেননা ইহারা অচেতন। এইজন্যই প্রস্তরাদির কোন ভয়ও নাই। অপর পক্ষে ফেরেশতাগণ যে উচ্চমর্যাদায় উপনীত রহিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহাদের পতন সম্ভব নহে। তাঁহাদের মর্যাদা অপরিবর্তনশীল ; যেমন আল্লাহ ফেরেশতাগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করেন ঃ وَمَامِنَّا اِلاَّ لَه مَقَام مَّعْلُوْم অর্থাৎ "আমাদের (ফেরেশতাগণের) মধ্যে এমন নাই যে স্বীয় অবস্থা ভালরূপে অবগত না আছে।" আবার পশু নিম্নতম স্তরে অবস্থিত। ইহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নহে। মানব ফেরেশতা ও পশু এই দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত এবং সে মহা সঙ্কটজনক স্থানে উপস্থাপিত। কারণ, সাধনা দ্বারা সে উন্নত হইয়া ফেরেশতার সমকক্ষ হইতে পারে, আবার অবনতির দিকে গড়াইয়া পড়িলে ইতর জন্তুর অবস্থায় পতিত হয়। আমানত বহনের জন্য উঠাইয়া লওয়ার অর্থ এই যে মানুষ ভয়মুক্ত সন্দেহজনক অবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। সুতরাং মানুষ ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে এই আমানতের বোঝা বহন করা সম্ভব নহে।

তুমি প্রতিবাদে বলিয়াছিলে, বেহেশত–দোযখ সম্বন্ধে এ-গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইল তাহা শরীয়তের আলিমগণের অধিকাংশের মতের বিপরীত। আর উত্তর দিতে যাইয়া

www.BANGLAKITAB.com

এতগুলির কথা বলা হইল। তাঁহাদের কথা শুনিয়া আশ্চর্য বোধ করিও না। কারণ, পথিকের অবস্থা স্থিতিশীল ব্যক্তির বিপরীত হইয়া থাকে। স্থিতিশীল বহু সংখ্যক, কিন্তু পথিক নিতান্ত কম। মানবের প্রথম মঞ্জিল জড়-জগতকেই যে ব্যক্তি স্বীয় বাসস্থান বানাইয়া লয় এবং ইহাতে চিরদিন স্থিতিশীল থাকে, সে কখনও কার্যাবলীর মূলতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। এরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

পরকাল-পরিচয়ের বিবরণ এ-পর্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। ইহা অতিরিক্ত বলিলে লোকে বুঝিবে না ; বরং যাহা বর্ণিত হইল তাহাই অধিকাংশ লোকে বুঝিতে সক্ষম হইবে না।

পরকাল-অবিশ্বাসীদের ভ্রম দূরীকরণে দুইটি সাধারণ যুক্তি ঃ দুনিয়াতে এমন মূর্খ বহু আছে যাহারা কার্য-কারণের প্রকৃত অবস্থা নিজে বুঝিতে পারে না ; অথচ শরীয়তের আদেশও তাহারা মানিয়া লয় না। পরকালের ব্যাপারে তাহারা আশ্চর্য বোধ করে এবং পরকাল- বিষয়ে সন্দেহ তাহাদের মনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। দুনিয়ার বাসনা কামনা তাহাদের মনে প্রবল হইয়া পড়িলে পরকালকে অস্বীকার করাই তাহাদের নিকট হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে। এইরূপে পরকালের প্রতি তাহাদের অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। শয়তান এই অবিশ্বসাককে আরও বাড়াইয়া দেয়। তখন তাহারা মনে করে, দোযখ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রতারণা মাত্র এজন্যই লোভ-লালসার বশবর্তী হইয়া লোকে শরীয়ত অস্বীকার করে এবং শরীয়ত অবলম্বীদিগকে অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকে। আর এই মূর্খগণ শরীয়ত-বিশ্বাসীদিগকে উপহাস করিয়া বলে ঃ "ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ব্যতীত তাহাদের ভাগ্যে আর কিছুই নাই।" পরকাল অবিশ্বাসী মূর্খদের তেমন ক্ষমতা কোথায় যে, ঐ প্রকার তত্ত্বপূর্ণ বিষয় প্রমাণাদি দ্বারা বুঝিতে পারে?

প্রথম ঃ পরকালে অবিশ্বাসীদিগকে একটি স্পষ্ট কথা বুঝিতে আহ্বান করা হইতেছে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে, "তোমাদের যদি এই ধারণা প্রবল হইয়া থাকে যে, একলক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর এবং জগতের সমস্ত আলিম ও ওলী সকলেই ভ্রমে পতিত ছিলেন ও প্রতারিত হইয়াছিলেন ; আর তোমাদের মূর্খতা ও ভ্রম সত্ত্বেও তোমাদের পক্ষে পরকালের বিষয় উপলব্ধি করা সম্ভব হইয়াছে, তবে জানিয়া রাখ, তোমরাই মহা ভুলে নিমগ্ন রহিয়াছ এবং তোমরাই ধোঁকায় পড়িয়াছ। পরকালের অবস্থা ও আত্মিক শাস্তি তোমরা বুঝিতে পার নাই। আধ্যাত্মিক বিষয় বুঝাইবার জন্য জড়-জগতের যে সকল উপমা লওয়া হইয়াছে উহা তোমরা বুঝিতে পার নাই।" ইহাতেও মূর্খ নিজ ভ্রম বুঝিতে না পারে এবং বলে ঃ "এক অপেক্ষা দুই অধিক, ইহা যেমন ধ্রুব সত্য জানি তদ্রূপ ইহাও জানি যে, আত্মার কোন মুল্য নাই, আত্মা চিরস্থায়ী

নহে এবং আত্মিক ও দৈহিক শাস্তিও শাস্তি হইতে পারে না" তবে তাহার স্বভাব একেবারেই বিগড়াইয়া গিয়াছে। তাহার পুনরুদ্ধারের কোন আশা নাই। এই প্রকার লোক সম্বন্ধেই আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْا اِذًا اَبَدًا ـ

অর্থাৎ "আপনি তাহাদিগকে সৎপথের দিকে আহ্বান করিলে তাহারা কখনও সৎপথে আসিবে না।"

দ্বিতীয় ঃ আবার পরকাল-অবিশ্বাসীদের কেহ যদি বলে ঃ "পরকালের সুখ-দুঃখ অসম্ভব নহে, হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ইহা বুদ্ধির সীমার বহির্ভূত। পরকালের সুখ-দুঃখের কথা ঠিকভাবে আমার জানা নাই, এমন কি উহা সত্য বলিয়া আমার মনে প্রবল ধারণাও জন্মে নাই, এমতাবস্থায় সন্দেহমূলক কথার উপর নির্ভর করত কিরূপে চিরজীবন নিজেকে পরহিযগারীর কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিব? আর দুনিয়ার সুখ-ভোগে কেনই বা বিরত থাকিব?"-তবে তাহার উত্তরে আমরা বলিব-তুমি দুর্বল বিশ্বাসে যখন এতটুকু স্বীকার করিলে যে, পরকালে সুখ-দুঃখ ঘটা অসম্ভব নহে, তখন বুদ্ধিমানের ন্যায় পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করতে শরীয়তের পথে তোমার চলা আবশ্যক। কারণ, বড় বিপদের অতি দুর্বল ধারণা জন্মিলেও লোকে ইহার ত্রিসীমায় যায় না। তুমি আহারে বসিয়াছ এমন সময় যদি কেহ বলে এ খাদ্যে সাপে মুখ দিয়াছিল, তবে তুমি নিশ্চয়ই আহারে বিরত থাকিবে। এস্থলে এমন ধারণাও হইতে পারে যে, সে মিথ্যা বলিয়াছে। তুমি না খাইলে সে খাইবে, এই উদ্দেশ্যে হয়ত মিথ্যা বলিয়াছে। কিন্তু তাহার কথা সত্যও হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় তুমি চিন্তা করিবে ঐ সন্দেহজনক খাদ্য আহার করা অপেক্ষা কিছুক্ষণ ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করা সহজ ; আর যদি আহার করি এবং তাহার কথা সত্য হয় তবে আমার মৃত্যু অনিবার্য। এইরূপ মনে কর, তুমি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত এবং ইহাতে তোমার মৃত্যুর আশঙ্কা আছে ; এমন সময় যদি কোন তাবীজ লেখক বলেন ঃ "তুমি একটি রৌপ্যমুদ্রা দাও। তোমার রোগমুক্তির জন্য কাগজে একটি তাবীজ লিখিয়া দিব এবং একটি চিত্র অঙ্কন করিয়া দিব। ইহা ধারণ করিলে পীড়া হইতে মুক্তি পাইবে।" যদিও তোমার প্রবল ধারণা আছে যে, ঐ প্রকার চিত্রের সহিত স্বাস্থ্যের কোনই সম্বন্ধ নাই, তথাপি তোমার মনে হইবে, হয়ত তাহার কথা সত্য হইতে পারে। তখন একটি রৌপ্যমুদ্রা দেওয়া তোমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইবে। যদি কোন গণক বলেন, "আসমানের অমুক স্থানে চন্দ্র উপস্থিত হইলে অমুক তিক্ত ঔষধ সেবন করিও, তাহাতে তুমি আরোগ্য লাভ করিবে।" তবে গণকের কথায় সেই তিক্ত ঔষধ সেবনের কষ্ট সহ্য করিবে এবং মনে মনে বলিবে, হয়ত গণক সত্যই বলিতেছে, আর অসত্য বলিলেও ঔষধ সেবনের কষ্ট অতি সামান্য।

www.BANGLAKITAB.com

অতএব ভাবিয়া দেখ, যে-বিষয়ে একলক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর, জগতের সমস্ত বুযর্গ আলিম ও আওলিয়া এক মতাবলম্বী, তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট একজন গণক, একজন তাবীজ লেখক বা একজন বিধর্মী চিকিৎসকের কথা অপেক্ষা অবিশ্বাস্য হইতে পারে না। ইহাদের কথায় তো তুমি দুনিয়ার বড় কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় তদপেক্ষা সামান্য কষ্ট স্বীকার করিয়া লও এবং সামান্য কষ্ট ও ক্ষতি অধিক কষ্ট ও ক্ষতির তুলনায় তোমার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। পরকালে অনন্ত জীবনের সহিত দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী পরমায়ুর তুলনা করিলে বুঝা যাইবে দুনিয়াতে শরীয়তের অধীনে চলিবার কষ্ট পরকালের ভীষণ বিপদের তুলনায় কত সামান্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া তুমি মনে মনে বলিতে পার, "যদি পয়গম্বর ও বুযুর্গগণের কথা সত্য হয় এবং তাঁহাদের কথা অনুযায়ী পরকালে কঠিন শাস্তিতে অনন্ত কালের জন্য নিপতিত হই, তবে কি করিব? দুনিয়ার কয়েক দিনের আরামে আমার কি উপকার হইবে? আবার বুযর্গগণ যাহা বলিতেছেন, তাহা নিতান্ত সম্ভবপর।" এইরূপ ভাবিয়াও তো তুমি সতর্কতা অবলম্বন করিতে পার।

পরকালের অসীমতা বুঝাইবার জন্য একটা উপমা দেওয়া যাইতেছে। মনে কর, সমস্ত বিশ্বজগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চনার দানায় পূর্ণ করত একটি পক্ষীকে হাজার হাজার বৎসর পরে একটি দানা করিয়া তুলিয়া লইতে নিযুক্ত করিলে দানাগুলি সমস্ত নিঃশেষ হইবে, কিন্তু পরকালের অসীমতার কিছুই কমিবে না। এত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যদি শাস্তি হয়, আর সেই শাস্তি আত্মিক হউক, শারীরিক হউক বা কাল্পনিক হউক তবে কিরূপে তাহা সহ্য করিবে? দুনিয়ার পরমায়ু পরকালের সেই অনন্তরকালের পরমায়ুর তুলনায় নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। এই সকল বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে এমন কোন বুদ্ধিমান নাই যে, পরকালের ঐ ভীষণ শাস্তি কাল্পনিক হইলেও ইহা হইতে বাঁচিবার জন্য দুনিয়ার সামান্য নিশ্চিত কষ্ট স্বীকার করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে না। লোকে বাণিজ্য উপলক্ষে জাহাজে আরোহণপূর্বক বহু দূরদেশে যাতায়াত করে এবং অনেক কষ্ট সহ্য করে। ইহা কেবল ভবিষ্যতের কাল্পনিক লাভের আশায়ই করিয়া থাকে। ফলকথা, পরকালের আযাবের প্রতি ঐ সকল মূর্খের দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলেও সন্দেহপূর্ণ দুর্বল বিশ্বাস তো আছে। সুতরাং শরীয়তের বোঝাটুকু বহন করিলেই তাহাদের নিজেদের উপর কিঞ্চিৎ দয়া করা হইবে।

উপরোক্ত মর্মেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা এক কাফিরের সহিত তর্ক করিতে করিতে অবশেষে বলিলেন ঃ "তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য হইলে তুমিও বাঁচিবে, আমিও বাঁচিব ঃ আর আমি যাহা বলিতেছি বাস্তবিকই তাহা সত্য হইলে

কেবল অমিই বাঁচিব, আর তুমি অনন্ত আযাবে পতিত থাকিবে।" তিনি এই কথা ঐ কাফিরের অল্পবুদ্ধি অনুযায়ী বলিয়াছিলেন। ইহাতে মনে করিও না যে, পরকাল সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে, দৃঢ় বিশ্বাসের পন্থা উপলব্ধি করিবার শক্তি ঐ কাফিরের ছিল না।

উপসংহার ঃ উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা হইতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরকালের পথের ব্যতীত অন্য বস্তু অর্জনে লিপ্ত হয়, সে বড় নির্বোধ। সংসারের মোহ ও পরকালের প্রতি উদাসীনতা এই নির্বুদ্ধিতার কারণ। কেননা, দুনিয়ার বাসনা-কামনা তাহাকে পরকালের বিষয় চিন্তা করিবারই অবকাশ দেয় না। অন্যথায় পরকালের আযাব সম্বন্ধে যাহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যাহার হৃদয়ে পরকালের শাস্তির প্রবল ধারণা আছে এবং ইহার প্রতি যাহার দুর্বল বিশ্বাস আছে, তাহাদের সকলকেই বুদ্ধিমানের মত ঐ ভীষণ সঙ্কট হইতে সভয়ে পলায়ন করা আবশ্যক এবং পূর্ব হইতে সতর্কতার পথ অবলম্বন করা কর্তব্য।

যাঁহারা উপদেশ মত চলেন

তাঁহাদের প্রতি সালাম।

দর্শন– পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

www.BANGLAKITAB.com

ইবাদত

প্রিয় পাঠক, ইতঃপূর্বে দর্শন-পরিচ্ছেদে তুমি মুসলমানদের প্রচ্ছদপট সম্বন্ধে অবগত হইয়াছ। আত্ম-পরিচয় এবং আল্লাহ, দুনিয়া ও আখিরাতের জ্ঞানও লাভ করিয়াছ। এখন মুসলমানী আমলের প্রতি মনোনিবেশ করা আবশ্যক। দর্শন-পরিচ্ছেদে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, একমাত্র আল্লাহ-পরিচয় ও ইবাদতের মধ্যেই মানুষের সৌভাগ্য নিহিত রহিয়াছে। দর্শন-পরিচ্ছেদের চারিটি অধ্যায় হইতে আল্লাহর পরিচয়- জ্ঞান লাভ হইয়াছে। পরবর্তী চারিটি খণ্ডে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন সম্বন্ধে জানা যাইবে। প্রথম খণ্ডের জাহেরী ইবাদত দ্বারা নিজকে সুশোভিত করিবার উপায় বর্ণিত হইবে। দ্বিতীয় খণ্ডে মুআমালাত অর্থাৎ জীবন গতিবিধি, বিবাহ-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি যাবতীয় কাজ কারবার অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিবার বিধি প্রদর্শিত হইবে। তৃতীয় বিনাশন খণ্ডে আত্মাকে মন্দ স্বভাব হইতে পবিত্র রাখিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ হইবে। চতুর্থ পরিত্রাণ খণ্ডে মানব-হৃদয়কে সদগুণরাজি দ্বারা সুশোভিত করিবার বিষয় বর্ণিত হইবে।

প্রথম অধ্যায়

সুন্নী মতানুসারে ধর্ম-বিশ্বাস দৃঢ়করণ

মুসলমানের প্রথম কর্তব্য ঃ মুসলমানের প্রথম কর্তব্য হইল তাহার মৌখিক স্বীকারোক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল) কলেমার মর্ম হৃদয়ে উত্তমরূপে উপলব্ধি করা এবং এই বিশ্বাসকে এইরূপ দৃঢ় করা যেন ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। এই কলেমার মর্ম সুষ্ঠুভাবে অন্তরস্থ করিলে এবং তৎপ্রতি একেবারে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস বদ্ধমূল করিলেই ঈমানের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মুসলমান হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট। যুক্তিতর্ক সহকারে ইহার কর্ম উপলব্ধি করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয নহে। কারণ, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরববাসীকে প্রমাণাদির অন্বেষণে, তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সন্দেহ তালাশ করত ইহার উত্তর প্রদানের আদেশ দান করেন নাই ; বরং উক্ত কলেমার মমার্থকে সত্য জানা ও তৎপ্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাকেই তিনি যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত সাধারণ মুসলমানের জন্য নহে। কিন্তু সরল বিশ্বাসী সাধারণ মুসলমানকে যাহাতে কোন বিধর্মী লোকে পথভ্রষ্ট করিতে না পারে এইজন্য তর্কবিদ্যায় পটু এবং যুক্তি সহকারে ধর্ম-বিশ্বাস ঠিক করিয়া দিতে ও সন্দেহ নিরসনপূর্বক বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিতে সক্ষম হয়, মুসলমান সমাজে এরূপ কিছু সংখ্যক লোকের একান্ত আবশ্যক। যে বিদ্যা দ্বারা ইহা করা যায় তাহাকে ইলমে কালাম (তর্কশাস্ত্র) বলে। এই বিদ্যা অর্জন করা ফরযে কেফায়া। (অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে এরূপ কয়েকজন আলিম স্থানে স্থানে বিদ্যমান থাকিলেই সারা বিশ্বের মুসলমান এ দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে। প্রত্যেক বস্তিতে এইরূপ দুই একজন লোক থাকিলেই যথেষ্ট। সাধারণ লোক ধর্মের প্রতি সরল বিশ্বাসী হইয়া থাকে। তর্কশাস্ত্রে পটু ব্যক্তি তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাসের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

www.BANGLAKITAB.com

মারিফাতের সহিত সরল বিশ্বাস ও তর্কশাস্ত্রের তুলনা ঃ মারিফাতের পথ সাধারণ মুসলমানের সরল বিশ্বাস ও তর্কশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম দ্বারা মারিফাত-পথের আরম্ভ হয়। এই পথে বিচরণ না করিয়া কেহই মারিফাতের দরজায় উপনীত হইতে পারে না। এই পথে না চলিয়া মারিফাতের দাবি কর শোভা পায় না। এরূপ দাবিতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ-মনে কর, কোন রোগী কুপথ্য পরিত্যাগ না করিয়া কেবল ঔষধই সেবন করিলে তাহার বিনাশ প্রাপ্তির আশঙ্কা প্রবল থাকে। কারণ, কুপথ্যসহ ঔষধ সেবন করিলে উদারস্থ বিকৃত ধাতু ও দূষিত রসের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া রোগ বৃদ্ধির কারণ হইয়া পড়ে। এই ঔষধে স্বাস্থ্য লাভ হয় না। দর্শন-খণ্ডে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা মারিফাতের নমুনাস্বরূপ। যাহার মধ্যে মারিফাত লাভের যোগ্যতা আছে শুধু তাহারই মারিফাত লাভের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। দুনিয়ার সহিত একেবারে সম্পর্কহীন এবং সারাজীবন একমাত্র আল্লাহর অন্বেষণে মশগুল, শুধু এমন ব্যক্তিই আল্লাহর মারিফাত লাভের অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইতে পারে। ইহা নিতান্ত কঠিন। তাই যাহা সমস্ত জগতের জীবিকাস্বরূপ অর্থাৎ সুন্নী মতানুসারে ধর্ম-বিশ্বাস, তাহাই এ স্থলে বর্ণিত হইতেছে। এই ধর্ম-বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লওয়া প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য। কারণ, ইহাই মানবের সৌভাগ্যের বীজ।

ধর্ম বিশ্বাস

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ঃ অবগত হও এবং বিশ্বাস কর যে, তোমার একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, তুমি তাঁহারই সৃষ্ট। কেবল তোমাকেই নহে বরং সমগ্র বিশ্বজগত এবং সমস্ত যাহা কিছু আছে সবই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি এক, তাঁহার কোন অংশী নাই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। তাঁহার আরম্ভ ও শেষ নাই। তিনি অনাদি ও চিরস্থায়ী। তাঁহার অস্তিত্বের শেষ সীমা নাই। তিনি অনাদিকাল হইতে আছেন এবং অনন্তকাল থাকিবেন। তাঁহার সম্বন্ধে অস্তিত্বহীনতার কোন প্রশ্নই উঠে না। তিনি স্বয়ং তাঁহার অস্তিত্বের কারণ ; অন্য কোন কারণ হইতে তাঁহার অস্তিত্ব উদ্ভূত নহে। বিশ্বজগতের সব কিছুই তাঁহার মুখাপেক্ষী। আপন হইতেই তিনি স্থিতিশীল, অথচ যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব তাঁহার উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহর পবিত্রতার উপর বিশ্বাস ঃ তিনি কোন মৌলিক বা গুণাধার বস্তুও নহেন অথবা কোন আনুষঙ্গিক বা গুণ-পদার্থও নহেন। তিনি কোন দ্রব্যে প্রবেশ করত একাকার হইয়া যান না। তিনি কোন পদার্থের সদৃশ নহেন এবং কোন পদার্থও তাঁহার সদৃশ নহে। তাঁহার কোন আকৃতি নাই ; তাঁহার মধ্যে পরিমাণ ও প্রকৃতির কোন অধিকার নাই। পরিমাণ ও প্রকৃতি বলিতে তাঁহার সম্বন্ধে কল্পনায় যাহা কিছু উদিত

হয়, তিনি উহার সবকিছু হইতেই পবিত্র। কারণ, যাবতীয় গুণ ও অবস্থা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সৃষ্ট বস্তুর কোন গুণ বা অবস্থা তাঁহার মধ্যে নেই। বরং কল্পনা বা ধারণার যত প্রকার আকার বা অবস্থার উদয় হয়, উহার সব কিছুই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ; ক্ষুদ্র, বৃহৎ ও পরিমাণ গুণের কোন সম্পর্কই তাঁহার সহিত নাই। এই সকল জগতের জড়বস্তুর গুণ। তিনি শরীরী নহেন। কোন শরীরী বস্তুর সহিত তাঁহার কোনই সামঞ্জস্য নাই। তিনি কোন স্থানে নহেন। কোন শরীরী বস্তুর সহিত তাঁহার কোনই সামঞ্জস্য নাই। তিনি কোন স্থানে নহেন এবং কোন স্থানে সীমাবদ্ধও নহেন। তাঁহার অস্তিত্ব এমন কোন জিনিসই নহে যাহা স্থান অধিকার করে। জগতে যাহা কিছু আছে সবই আরশের নিচে এবং আরশ তাঁহার ক্ষমতাধীন। আর তিনি আরশের উপর আছেন। কিন্তু আরশের উপর তাঁহার অবস্থান কোন পদার্থের উপর অপর শরীরী পদার্থের অবস্থানের মত নহে। কারণ, তিনি শরীরী নহেন। আরশ তাঁহাকে ধারণ ও বহন করিতেছেন না ; বরং তাঁহার শক্তি ও অনুগ্রহে আরশ ও আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ বিদ্যমান আছে। আরশ সৃষ্টি করিবার পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন আজও তেমনই আছেন এবং অনন্তকাল এইরূপই থাকিবেন। কেননা তাঁহার সত্তা ও গুণাবলীতে কোন প্রকার পরিবর্তন নাই। ইহার কারণ এই যে, তাঁহার গুণের পরিবর্তন ঘটিয়া কমিয়া গেলে তিনি আল্লাহ হওয়ার বিল্লাহ, তিনি অপূর্ণ ও পূর্ণতার মুখাপেক্ষী থাকিতেন। মাখলুক মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, মুখাপেক্ষী আল্লাহ হওয়ার যোগ্য নহে। তাঁহার গুণাবলী সৃষ্ট পদার্থের গুণাবলী সদৃশ না হইলেও এ-জগতে তিনি পরিচিত হওয়ার যোগ্য এবং পরকালে তিনি দর্শনের উপযোগী। এ-জগতে যেমন তাঁহাকে সাদৃশ ও প্রকৃতি ব্যতীতই চিনা যায়, পরকালেও তদ্রূপ তাঁহাকে সদৃশ ও প্রকৃতি ছাড়াই দেখা যাইবে। কারণ, পরকালের দর্শন এ-জগতের দর্শনের অনুরূপ নহে।

আল্লাহর ক্ষমতায় বিশ্বাস ঃ আল্লাহ কোন পদার্থের তুল্য নহেন। তথাপি তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। তাঁহার ক্ষমতা স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইহাতে কোন প্রকার ত্রুটি, অপূর্ণতা ও দুর্বলতার লেশমাত্র নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছেন এবং করিবেন। সাত আসমান , সাত যমীন, আরশ, কুরসী এবং আরও যত কিছু আছে সবই তাঁহার ক্ষমতাধীন ও বশীভূত। এই সমস্তের উপর তাঁহার ছাড়া অপর কাহারো কোন অধিকার নাই। সৃষ্টিকার্যেও তাঁহার কোন সাথী ও সাহায্যকারী নাই।

আল্লাহর জ্ঞানে বিশ্বাস ঃ তিনি জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ এবং তাঁহার জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সর্বোচ্চ আরশ হইতে নিম্নতম পাতাল পর্যন্ত কোন জিনিসই তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে নহে। কারণ, সকল জিনিস তাঁহার আদেশেই প্রকাশ পায়। এমনকি মরুভূমির বালুকণা, বৃক্ষাদির পত্র-পল্লব, মানব-হৃদয়ে কল্পনাসমূহ এবং বায়ু-কণিকার সংখ্যা তাঁহার জ্ঞানে আসমানের সংখ্যার ন্যায় পরিস্ফুট।

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর অভিপ্রায়ে বিশ্বাস ঃ বিশ্বে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হইয়াছে। অল্প-বেশি, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য কুফর-ঈমান, লাভ-লোকসান, ক্ষতি-বৃদ্ধি, শান্তি- অশান্তি, সুস্থতা- অসুস্থতা এই সমস্তই তাঁহার ক্ষমতা ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। সমস্ত জিন ও মানুষ, শয়তান ও ফেরেশতা সববেত হইয়া জগতের একটি রেণু নাড়িতে বা স্থানচ্যুত করিতে অথবা উহাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করিলেও আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতীত কিছুই করিতে পারিবে না। কখনই করিতে পারিবে না। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কোন জিনিসই অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না এবং তিনি যাহা করিতে ইচ্ছা করেন তাহাতে কেহই কোন বাধা প্রদান করিতে পারে না। যাহা কিছু ছিল, আছে ও হইবে, সমস্তই তাঁহার নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়া থাকে।

আল্লাহর শ্রবণ ও দর্শন-ক্ষমতার বিশ্বাস ঃ তিনি যেমন সবই জানেন তদ্রূপ সবই দেখেন ও শুনেন। দূরবর্তী ও নিকটবর্তী শব্দ তিনি সমভাবেই শ্রবণ করিয়া থাকেন। অন্ধকার রাত্রিতে তিনি পিপীলিকার পদধ্বনি শুনিতে পান এবং পাতালপুরীতে যে-কীট আছে তাহার বর্ণ ও অকৃতি দর্শন করিয়া থাকেন। কারণ, তিনি চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন না, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করেন না। তাঁহার বোধ-শক্তি যেমন চেষ্টা ও চিন্তালব্ধ নহে, সেইরূপ তাঁহার সৃজনও কোন প্রকার যন্ত্রের মুখাপেক্ষী নহে।

আল্লাহর বাক-শক্তিতে বিশ্বাস ঃ আল্লাহর আদেশ পালন সকলের কর্তব্য। তিনি যে-সংবাদ দিয়াছেন তাহা সত্য। তিনি পুরস্কার দিবার যে ওয়াদা ও শাস্তি প্রদানের যে-ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা সবই সত্য। আদেশ, খবর, ওয়াদা, ভীতি-প্রদর্শন, সমস্তই তাঁহার বাণী। তিনি যেমন জীবিত, দর্শনকারী, জ্ঞানময়, শ্রবণকারী ও শক্তিশালী তদ্রূপ তিন বক্তাও বটে। তিনি হযরত মূসা আলায়হিস সালামের সহিত সরাসরি কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথা জিহ্বা, ওষ্ঠ ও মুখগহ্বরে সাহায্যে নহে। মানব- হৃদয়ে যেমন স্বর ও অক্ষর ব্যতীত কথার উদয় হয় তদ্রূপ স্বর ও অক্ষর ব্যতীত আল্লাহর কথা নিষ্পন্ন হওয়া অধিকতর শোভন ও সমীচীন। কুরআন শরীফ, তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর এবং আরও যত কিতাব নবী (আ)-গণের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে সবই আল্লাহর বাণী। কথন (কালাম) তাঁহার একটি গুণ। তাঁহার সমস্ত গুণই অনাদি ও অনন্ত। তাঁহার অস্তিত্ব অনাদি, কিন্তু হৃদয়ে তাঁহাকে আমরা উপলব্ধি করি এবং রসনা দ্বারা তাঁহার নাম উচ্চারণ করি। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের লব্ধ জ্ঞান ও তাঁহার যিকির সৃষ্ট (مَخْلُوْق) কিন্তু জ্ঞাতব্য বস্তু ও উচ্চারিত বিষয় অনাদি। সেইরূপ তাঁহার কালামও অনাদি। তৎপর ইহা আমাদের অন্তরে রক্ষিত, মুখে পঠিত ও কিতাবে লিখিত হয়। আমাদের অন্তর এর রক্ষিত বিষয় সৃষ্ট নহে, লিখন- কার্যটি সৃষ্ট।

আল্লাহর কার্যাবলীতে বিশ্বাস ঃ বিশ্বজগত ও বিশ্বজগতে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার সৃষ্ট। যে বস্তুকে তিনি যে আকারে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই ইহার সর্বোৎকৃষ্ট রূপ। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি যদি তাঁহাদের সমস্ত জ্ঞান একত্র করত সমবেতভাবে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপ উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করেন, যে কৌশলে তিনি উহা সৃষ্টি করিয়াছেন তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কৌশল বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন অথবা উহাতে কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, তবে তাঁহারা বর্তমান অবস্থা বা আকৃতি অপেক্ষা কোন অবস্থাকেই উৎকৃষ্ট বলিতে পারিবেন না। যদি কেহ মনে করে যে, এই অবস্থা বা আকৃতি অপেক্ষা অন্য অবস্থা উত্তম হইত তবে সে ভুল করিবে এবং আল্লাহর কৌশল ও সৃষ্টি নিয়মের মঙ্গলজনক তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এমন লোকের দৃষ্টান্ত এইরূপ-মনে কর, এক অন্ধ এক গৃহে প্রবেশ করিল। সেই গৃহে প্রত্যেকটি বস্তু সযত্নে শৃঙ্খলার সহিত নিজ নিজ স্থানে সজ্জিত রহিয়াছে। কিন্তু সে দেখিতে পায় না বলিয়া গৃহের কোন জিনিসের সহিত ঠোকর খাইয়া পড়িয়া গেল এবং বলিতে লাগিল-"এই জিনিসটি পথের উপর কেন রাখা হইল?" অথচ সে চলিবে কিরূপে? সে তো পথ দেখিতেই পায় না। আল্লাহ সুবিবেচনা ও সুকৌশলের সহিত যথোপযুক্ত পূর্ণভাবে প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যেমন ইচ্ছা করিয়াছেন তেমনই সৃষ্টি করিয়াছেন ; তিনি যেমন সৃষ্টি করিয়াছেন তদপেক্ষা সুন্দর ও পূর্ণভাবে সৃষ্টি সম্ভব হইলে, কিন্তু তেমনভাবে সৃষ্টি না করিয়া থাকিলে ইহাতে সৃষ্টিকর্তার অক্ষমতা ও কৃপণতা প্রকাশ পাইত। অথচ সৃষ্টিকর্তার মধ্যে অক্ষমতা ও কৃপণতা থাকা-একেবারে অসম্ভব। সুতরাং রোগ-শোক, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, দুর্বলতা ইত্যাদি যাহা কিছু তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সবের মধ্যেই সুবিচার রহিয়াছে। তাঁহার দ্বারা অবিচার হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার নাম অবিচার, আর অন্যের অধিকরে হস্তক্ষেপ করা আল্লাহর পক্ষে সম্ভবই নহে। কেননা তিনি ভিন্ন অন্য মালিক থাকিতেই পারে না। যাহা কিছু অতীতে ছিল, যাহা কিছু বর্তমানে বিদ্যমান আছে এবং যাহা কিছু ভবিষ্যতে হইবে, ইহাদের সবই তাঁহার অধিকারে একমাত্র তিনিই ইহাদের মালিক। তাঁহার কোন সমকক্ষ ও শরীক নাই।

পরকালে বিশ্বাস ঃ আল্লাহ বিশ্বজগতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা ঃ জড়জগত ও আত্মিক জগত। পরকালের পাথেয় সংগ্রহের জন্য জড়জগতকে মানবাত্মার আবাসস্থল বানাইয়াছেন এবং জগতে প্রত্যেক মানুষের অবস্থানকাল নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই নির্দিষ্ট কালের শেষ সীমা মৃত্যু। এই নির্দিষ্ট কালের পরিমাণে কিছুতেই বেশি বা কম হইতে পারে না। মৃত্যু আসিয়া শরীর হইতে প্রাণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়। শেষ বিচারের দিনে দেহে আবার প্রাণ সঞ্চার করা হইবে এবং সকলকে বিচারের জন্য দণ্ডায়মান করা হইবে। তখন প্রত্যেকেই কৃতকর্ম

www.BANGLAKITAB.com

আমলনামায় লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবে। সেইদিন দুনিয়াতে সে যাহা কিছু করিয়াছে সমস্তই তাহার স্মরণপটে উদিত হইবে। পাপ-পূণ্য ওজন করিবার উপযোগী দাঁড়িপাল্লায় পাপ-পুণ্য ওজন করিয়া উহার পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে। দুনিয়ার মাপ-যন্ত্রের সহিত এই দাঁড়ি-পাল্লার কোন সামঞ্জস্য নাই।

পুলসিরাত ঃ তৎপর পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য সকলকেই আদেশ করা হইবে। ইহা চুল অপেক্ষা সরু এবং তরবারি অপেক্ষা ধারাল। দুনিয়াতে যাহারা শরীয়তের উপর অটল রহিয়াছে তাহারা অনায়াসে পুলসিরাত অতিক্রম করিয়া যাইবে। আর দুনিয়াতে যাহারা শরীয়ত অবলম্বন করে নাই তাহারা পুলসিরাত অতিক্রমে অক্ষম হইয়া দোযখে পতিত হইবে। সকলকে পুলসিরাতের উপর দাঁড় করাইয়া দুনিয়াতে কৃতকর্মসমূহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। ঈমানদারগণের নিকট হইতে তাহাদের ঈমানের যথার্থতা তলব করা হইবে। মুনাফিক ও রিয়াকারিদিগকে তীর লাঞ্ছনা প্রদান করা হইবে। এক শ্রেণীর লোককে বিনা হিসাবে বেহেশতে লইয়া যাওয়া হইবে। কোন শ্রেণীর লোকের হিসাব-নিকাশ সদয় ও সহজভাবে করা হইবে। আবার কোন শ্রেণীর লোকের হিসাব-নিকাশ কঠিনভাবে করা হইবে। কাফিরদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। তাহারা কখনই মুক্তি পাইবে না। ফরমাবরদার মুসলমানদিগকে সরাসরি বেহেশতে প্রেরণ করা হইবে। পাপী মুসলমানদিগকে দোযখে প্রবেশের আদেশ দেওয়া হইবে। কিন্তু আম্বিয়া (আ) ও বুযর্গগণ তন্মধ্য হইতে যাহাদের জন্য শাফা'আত করিবেন, পরম করুণাময় আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। যাহাদের জন্য তাঁহারা সুপারিশ করিবেন না, ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করিবেন। তাহাদের পাপের পরিমাণে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা হইবে। তৎপর তাহাদিগকে বেহেশতে আনয়ন করা হইবে।

পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস ঃ আল্লাহ মানুষের কতগুলি কার্যকে তাহাদের দুর্ভাগ্যের কারণ এবং কতগুলিকে তাহাদের সৌভাগ্যের উপকরণরূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ বুঝিতে পারে না, কোন কার্যে তাহাদের দুর্ভাগ্য এবং কোন কার্যে সৌভাগ্য নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং তিনি পয়গম্বর (আ)-গণকে পয়দা করত সৃষ্টির আদিতে যাঁহাদের ভাগ্যে পূর্ণ সৌভাগ্যের বিধান হইয়াছে তাঁহাদের নিকট এই রহস্য উদঘাটনের নির্দেশ প্রদান করিলেন এবং লোকের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের পথ বাতাইবার জন্য তাঁহাদিগকে সমস্ত বিশ্বমানবের নিকট প্রেরণ করিলেন। জগতবাসী যেন আল্লাহর প্রতি দোষারোপ করিতে না পারে তজ্জন্যই তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন। পরিশেষে নবীকুল শিরোমণি বিশ্বের অবিসংবাদিত সরদার সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মানবজাতির হিদায়েতের জন্য প্রেরিত হন। তাঁহার নবুয়তকে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণতা গুণে বিভূষিত করত এত উচ্চ শিখরে উন্নীত করিয়া দিয়াছেন যে, তদপেক্ষা উন্নতি কোন নবীর পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তিনি এইরূপ গুণে গুণান্বিত হইয়া সর্বশেষ নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার ফলে তাঁহার পরে কিয়ামত পর্যন্ত অপর কোন নবী আবির্ভূত হওয়ার প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হইয়াছে। বিশ্বের সমস্ত জ্বিন ও মানবকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে আম্বিয়া শ্রেষ্ঠ, সকল নবীর সরদার করা হইয়াছে। তাঁহার সাহাবাগণকে অন্যান্য নবীর সহচর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইল্‌ম অন্বেষণ

যে ইল্‌ম অন্বেষণ ফরয ঃ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ -

অর্থাৎ "ইল্‌ম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর প্রতি ফরয।" কোন্ ইল্‌ম অন্বেষণ করা ফরয সে-সম্বন্ধে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আকাইদ শাস্ত্রবিদগণ বলেন, উক্ত হাদীসের মর্মে ইল্‌মে কালাম শিক্ষা করাই ফরয; কেননা এই শাস্ত্রের সাহায্যেই আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করা যায়। ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ বলেন, উক্ত হাদীছে ইল্‌মে ফিকাহ্‌র কথাই বলা হইয়াছে। কারণ ফিকাহ্-শাস্ত্র দ্বারাই হালাল-হারামে পার্থক্য করা যায়। মুহাদ্দিসগণ বলেন, কুরআন ও হাদীসের ইল্‌ম শিক্ষার কথাই ঐ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে; কেননা উহাই শরীয়তের ইল্‌মের মূল। সূফিগণ বলেন, ঐ ইল্‌মের উদ্দেশ্য হইল ইল্‌মে তাসাওওফ। কারণ, একমাত্র আত্মসংশোধন দ্বারাই মানুষ আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হইতে পারে। মোটকথা, প্রত্যেক শ্রেণীর আলিম নিজ নিজ ইল্‌মের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে উক্ত হাদীসে কোন বিশেষ ইল্‌মের প্রতি লক্ষ্য করা হয় নাই অথবা সর্বপ্রকার ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয করিয়া দেওয়া হয় নাই। বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক যাহাতে সব মতভেদ দূরীভূত হয়।

মনে কর, প্রাতঃকালে কোন কাফির মুসলমান হইল অথবা কোন নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। তৎক্ষণাৎ সব ইল্‌ম শিক্ষা করা তাহাদের উপর ফরয হইয়া পড়ে না। সেই সময় শুধু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কলেমার মর্ম অবগত হওয়াই তাহাদের উপর ফরয। এই কলেমার মর্ম এবং ইহার আনুষঙ্গিক যে-সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন আবশ্যক, তাহা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বাসসমূহের সপক্ষের প্রমাণাদি অবগত হওয়া আবশ্যক নহে; প্রমাণাদি অবগত হওয়া তাহাদের জন্য ওয়াজিব নহে। তবে আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের যাবতীয় গুণাবলী, পরকাল, বেহেশ্‌ত, দোযখের প্রতি তাহার বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। তাহাদের জানা উচিত, আল্লাহ্ এই গুণে বিভূষিত এবং আল্লাহ্‌র তরফ হইতেই এই

সকল খবর ও নির্দেশাবলী লইয়া রসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তশ্‌রীফ আনিয়াছেন। সুতরাং যে-ব্যক্তি তাঁহার আদেশ নিষেধ মানিয়া চলিবে সে-ব্যক্তি মৃত্যুর পর পরম সৌভাগ্য লাভ করিবে এবং যে-ব্যক্তি অমান্য করত পাপকার্য করিবে সে দুর্ভাগ্যে নিপতিত হইবে।

উক্ত প্রকার লোকদের ক্রমশিক্ষণীয় বিষয় ঃ উক্ত বিষয়গুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর দুই প্রকার ইল্‌ম শিক্ষা করা নও-মুসলিম ও সদ্য বয়ঃপ্রাপ্তদের উপর ওয়াজিব হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে এক প্রকার আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং অপর প্রকার বাহ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট। বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট ইল্‌ম আবার দুই ভাগে বিভক্ত-(১) করণীয় কার্য সম্বন্ধীয় ইল্‌ম ও (২) বর্জনীয় কার্য সম্বন্ধীয় ইল্‌ম। করণীয় কার্য সম্বন্ধীয় ইল্‌ম এইরূপ—যেমন প্রাতঃকালে কোন কাফির মুসলমান হইল। জোহরের নামাযের সময় হইলে কেবল ফরয পরিমাণ ওযূ-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতা লাভের নিয়ম এবং ফরয নামায আদায় করিবার প্রণালী শিক্ষা করা তাহার উপর ফরয হইবে। যাহা সুন্নত তাহা শিক্ষা করাও সুন্নত, ফরয নহে। মাগরিবের নামাযের সময় হইলে তিন রাকআত ফরয নামায জানা তাহার উপর ফরয হইবে। ইহার অতিরিক্ত জানা ফরয নহে। রমযান মাস উপস্থিত হইলে রোযা সম্বন্ধে এতটুকু জানা ফরয হইবে যে, রোযার নিয়ত করা ওয়াজিব এবং সুবেহ্ সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস হারাম। বিশটি দীনার হস্তগত হওয়া মাত্রই যাকাত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা ফরয হয় না। কিন্তু এই মুদ্রাগুলি এক বৎসর কাল কাহারও অধিকারে থাকিলে যাকাতের পরিমাণ, যাকাত দিবার উপযুক্ত পাত্র ও ইহার শর্তাবলী অবগত হওয়া তাহার উপর ফরয হইবে। হজ্জে যাওয়ার সময় হজ্জ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করা ফরয হয়। কারণ, হজ্জের সময় মৃত্যু পর্যন্ত। এরূপ যখন যে বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয় তখনই সে-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা ফরয হয়; যেমন বিবাহের সময় বিবাহ-সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন করা ফরয হইয়া পড়ে—স্বামীর নিকট স্ত্রীর কি কি প্রাপ্য, হায়েযের অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস দুরস্ত নহে, হায়েযের পর গোসলের পূর্বে সহবাস অনুচিত; এতদ্ব্যতীত আরও যে সকল কর্তব্য বিবাহের সহিত সংশ্লিষ্ট তৎসমুদয়ের জ্ঞান লাভ করা ফরয হয়। যে ব্যক্তি যে পেশা অবলম্বন করে সে-পেশা সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করা তাহার উপর ফরয হইয়া দাঁড়ায়। ব্যবসায়ীদের সুদের মাস্'আলা ও ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানসমূহ জানিয়া লওয়া ফরয। কারণ, এইগুলি জানা থাকিলে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের ব্যাপারে হারাম কার্য হইতে বাঁচা যায়। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু প্রয়োজন হইলে চাবুক মারিয়া দোকানদারগণকে ইল্‌ম শিক্ষা করিতে পাঠাইতেন এবং বলিতেন ঃ "যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের বিধি-নিষেধ না জানে তাহার ব্যবসায় করা উচিত নহে। ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান জানা না থাকিলে অজ্ঞাতসারে সুদ খাইবে, অথচ এ সম্বন্ধে সে কিছুই জানিবে না।" এইরূপ প্রত্যেক পেশারই নির্দিষ্ট

www.BANGLAKITAB.com

বিধান আছে। এমন কি নাপিতের জানা উচিত, মানব-শরীরের কোন্ জিনিস কাটিবার উপযোগী, দাঁতে পীড়া হইলে কিরূপে পীড়াগ্রস্ত দাঁত উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হয় এবং কি পরিমাণে ঔষধে ক্ষতস্থান আরোগ্য হয় এবং এবম্বিধ অন্যান্য বিষয়ও তাহার জানা আবশ্যক। (পূর্বকালে এই-সকল কাজও নাপিতেরাই করিত)। নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী বিদ্যাশিক্ষা করা সকল লোকের উপরই অবশ্য-কর্তব্য। নাপিতের উপর বস্ত্র-ব্যবসায়ীর বিদ্যা এবং বস্ত্র-ব্যবসায়ীর উপর নাপিতের বিদ্যাশিক্ষা করা ফরয নহে। করণীয় কর্মের জ্ঞান সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ উপরে দেওয়া হইল।

এইরূপ বর্জনীয় কর্মের জ্ঞান অর্জন করাও ফরয। কিন্তু লোকের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। কোন ব্যক্তিকে রেশ্‌মী কাপড় পরিধান করিতে, মদ্যপায়ী বা শূকরের মাংস ভক্ষণকারীর সহিত কিংবা বলপূর্বক অন্যের অধিকৃত স্থানে বাস করিতে অথবা হারাম মাল নিজের অধিকারে রাখিতে ও এবম্বিধ শরীয়ত বিগর্হিত কার্য করিতে কোন আলিম দেখিতে পাইলে তাহাকে উহা হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কার্য যে হারাম ইহা জানাইয়া দেওয়া উক্ত আলিমের উপর ওয়াজিব হইয়া পড়ে। কোন স্থানে নারী পুরুষ একত্রে বাস করিতে হইলে কোন্ নারী মহ্‌রম, কে মহ্‌রম নহে এবং কাহাকে দেখা জায়েয ও কাহাকে দেখা জায়েয নহে জানিয়া লওয়া ফরয। এ সমস্ত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা লোকের অবস্থানুযায়ী পরিবর্তন হইয়া থাকে। কারণ, এক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির জন্য অপর লোকের কর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করা ফরয নহে; যেমন হায়েযের অবস্থায় তালাক দেওয়া অনুচিত, ইহা জানা স্ত্রীলোকের প্রতি ফরয নহে; তালাক দিতে ইচ্ছুক পুরুষের উপর তালাকের মাস্'আলা জানা ফরয।

আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ক্রমশিক্ষণীয় ইল্‌ম ঃ আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ইল্‌মও দুই ভাগে বিভক্ত (১) হৃদয়ের অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট ও (২) ধর্মবিশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। হিংসা-বিদ্বেষ, মন্দ ধারণা ইত্যাদি কু-স্বভাবগুলির সম্বন্ধ হৃদয়ের সহিত। এই সকল কুস্বভাব পোষণ করা হারাম। এইগুলিকে হারাম বলিয়া জানাও প্রত্যেকের উপর ফরয। কারণ, কেহই এই সকল স্বভাব হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারে না। এই চরিত্রগত পীড়াগুলি ব্যাপক। সুতরাং ইহাদের প্রকৃত পরিচয় এবং এইগুলি দূর করিবার ব্যবস্থা অবগত হওয়াও ফরয। কারণ, রোগের পরিচয় না জানিলে ঔষধের ব্যবস্থা করা যায় না। অপরপক্ষে ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, রেহেন প্রভৃতি লেনদেন সম্পর্কীয় ফিকাহ শাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত বিষয়সমূহ জানা ফরযে কিফায়াহ্; সকলের উপর ফরয নহে। যাহারা এই সকল কার্য করিতে ইচ্ছুক কেবল তাহাদের উপরই এই জ্ঞান লাভ করা ফরয। এই সকল কার্য সকল লোকের ব্যবসায় নহে; তন্মধ্য হইতে একটি, কেহ বা একাধিক অবলম্বন করিয়া থাকে।

ধর্ম-বিশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট ক্রমশিক্ষণীয় ইল্‌মের দৃষ্টান্ত এই—কাহারও ধর্ম-বিশ্বাসের যদি কোনরূপ সন্দেহ জন্মে এবং ইহা কোন ওয়াজিব জাতীয় বিশ্বাসের সম্বন্ধে জাগিয়া থাকে অথবা এই সন্দেহ পোষণ করা যদি নাজায়েয হয়, তবে তাহা অন্তর হইতে দূর করা ফরয। অতএব বুঝা গেল যে, বিভিন্ন বিষয়ের ইল্‌ম বিভিন্ন ব্যক্তির উপর ফরয হইলেও মোটের উপর ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। কারণ, ইল্‌মের অভাব ও প্রয়োজনীয়তা কমবেশি প্রত্যেকেরই আছে। আবার ইল্‌ম এক প্রকার নহে এবং সকলের জন্য ইল্‌মের আবশ্যকতাও সমান নহে। বরং অবস্থা ও কালভেদে এই আবশ্যকতার পরিবর্তন হইয়া থাকে। আর ইল্‌মের আবশ্যকতা নাই এইরূপ লোক কেহই নাই। এইজন্যই রসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরূপ কোন মুসলমানই নাই যাহার উপর ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয নহে; অর্থাৎ যাহার যে ইল্‌মের প্রয়োজন সে ইল্‌ম শিক্ষা করাই তাহার উপর ফরয।

অজ্ঞতার আপত্তি অগ্রাহ্য ঃ উপরের বিবরণ হইতে জানা গেল যে, জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যখন যাহার যে-ব্যবসায় অবলম্বনের আবশ্যক হয় তখনই সেই সম্বন্ধীয় ইল্‌ম হাসিল করা তাহার উপর ফরয হইয়া পড়ে। আরও বুঝা গেল যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা সব সময়ই রহিয়াছে। কারণ, তাহাদের সম্মুখে কোন কাজ আসিয়া উপস্থিত হইলে পাপ-পুণ্যের বিচার না করিয়া অজ্ঞতাবশত তাহারা উহা নিঃসঙ্কোচে করিয়া বসে। এরূপ কার্য বিরল নহে এবং তাহাদের সম্মুখে প্রায়ই আসিয়া পড়ে। এমতাবস্থায় পাপ কার্য করিয়া অজ্ঞতার আপত্তি পেশ করিলে তাহা মোটেই গ্রাহ্য হইবে না। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, হায়েযের অবস্থা বা হায়েযের পর গোসলের পূর্বে কোন ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাস করিয়া যদি বলে, ইহা নিষিদ্ধ বলিয়া আমি জানিতাম না, তবে তাহার এই অজ্ঞতার ওযর মোটেই গ্রাহ্য হইবে না। কোন স্ত্রীলোক ফজরের পূর্বে হায়েয হইতে পাক হইয়া যদি পূর্ববর্তী মাগরিব ও ইশার নামাযের কাযা আদায় না করিয়া বলে, এই কাযা আদায় করিতে হইবে বলিয়া আমার জানা ছিল না[১] অথবা কোন ব্যক্তি হায়েযের অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিয়া যদি বলে, ইহা হারাম বলিয়া আমি জানিতাম না, তবে তাহাদের অজ্ঞতার আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলাম যে, ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয, তবুও ইল্‌ম শিক্ষা না করিয়া হারামে নিপতিত হইলে কেন? কিন্তু যে কাজ অতি বিরল, কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে, তাহা অজ্ঞতাবশত

(১) এমতাবস্থায় হানাফী মযহাব মতে মাগরিবের নামায কাযা আদায় কারিতে হইবে না।—অনুবাদক।

www.BANGLAKITAB.com

শরীয়ত খেলাপ করিয়া বসিলে এমন ক্ষেত্রে ওযর-আপত্তি গ্রাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মোটকথা, অজ্ঞতাবশত নাজায়েয কার্য অবলম্বনপূর্বক পাপে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা হইতে সাধারণ লোক কখনই নিরাপদ নহে। সুতরাং ইল্‌ম অন্বেষণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মহৎ কাজ মানুষের আর নাই।

ইল্‌মের কারণে জীবিকার্জন হইলে ইহাই অন্যান্য ব্যবসা হইতে উত্তম ঃ দুনিয়ার জন্যই মানুষ পেশা অবলম্বন করিয়া থাকে। এই কারণে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই ইল্‌ম উত্তম পেশা; কেননা, ইল্‌ম-শিক্ষার্থীদের চারিটি শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণী, ওয়ারিস বা অন্য কোন সূত্রে যাহারা যথেষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হইয়া নিশ্চিন্ত মনে ইল্‌ম শিক্ষা করিতে পারে। ইল্‌মের সাহায্যে তাহাদের ধন-সম্পত্তি রক্ষা পাইয়া থাকে এবং ইল্‌মই দুনিয়াতে তাহাদের সম্মান ও আখিরাতে তাহাদের সৌভাগ্যের কারণ। দ্বিতীয় শ্রেণী, যাহাদের যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহা লইয়াই তাহারা পরিতুষ্ট এবং 'দরিদ্র মুসলমান ধনী মুসলমানদের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে' এই মরতবা তাহারা ভালরূপে উপলব্ধি করিয়াছে। ইল্‌ম তাহাদের জন্য দুনিয়াতে সুখ ও আখিরাতে সৌভাগ্যের কারণ হইবে। তৃতীয় শ্রেণী, যাহারা মনে করে, ইল্‌ম শিক্ষা করিলে সরকারী ধনভাণ্ডার অথবা মুসলমানদের নিকট হইতে জীবিকা নির্বাহের উপযোগী হালাল মাল মিলিবে এবং হারাম মাল অন্বেষণ ও জালিম বাদশাহের নিকট কিছু যাচ্‌ঞা করিতে হইবে না। এই তিন শ্রেণীর ইল্‌ম শিক্ষার্থীদের পক্ষে ইল্‌ম অন্বেষণই দুনিয়ার সর্ববিধ পেশা হইতে উত্তম। চতুর্থ শ্রেণী, যাহারা দরিদ্র; কিন্তু দুনিয়া অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করে। আর যমানাও এমন হয় যে, সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে আলিমকে কোন বৃত্তি দেওয়া হয় না। সুতরাং হারাম মাল গ্রহণ বা অন্যায়ভাবে জীবিকা অর্জন করিতে হয়; অথবা সমাজ দরিদ্র আলিমের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করে না এবং জীবিকা অর্জনের অন্য উপায় নাই বলিয়া কপট ধার্মিক সাজিয়া কিংবা আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়, তবে এমন লোকের পক্ষে এবং যাহারা মান-সম্মান, ধন-সম্পত্তি লাভের জন্য ইল্‌ম শিক্ষা করে ও অর্জিত ইল্‌মের সাহায্যে মান-সম্মান ও ধন-সম্পত্তিই অর্জন করিবে, তাহাদের জন্য যে পরিমাণ ইল্‌ম তাহাদের উপর ফরয তাহা শিক্ষা করত অপর কোন অর্থকরী শিল্প, ব্যবসায় ইত্যাদি অবলম্বন করাই শ্রেয়। অন্যথায় এই শ্রেণীর আলিম অপর লোকের জন্য মানবরূপ শয়তানে পরিণত হইবে এবং বহু লোক তাহার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত পথভ্রষ্ট হইবে। কারণ, এইরূপ আলিমকে হারাম মাল গ্রহণ করিতে ও নানা প্রকার টালবাহানা করত হারামকে জায়েয করিতে দেখিয়া মূর্খ লোকে দুনিয়ার লাভের জন্য তাহার অনুসরণ করিবে। ফলে সৎপথ প্রদর্শনের পরিবর্তে গোমরাহী অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। এই শ্রেণীর আলিম যত কম হইবে ততই মঙ্গল;

কারণ, আবর্জনা যত কম হয় দুনিয়া ততই পরিষ্কার থাকে। সুতরাং যাহারা দুনিয়া অর্জন করিতে চায়, দুনিয়ার কার্য দ্বারাই ইহা হাসিল করা তাহাদের পক্ষে শ্রেয়; কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই আল্লাহ্‌র নাম লওয়া উচিত এবং দীনের কার্যের ভান করিয়া দুনিয়া হাসিল করা উচিত নহে; উজ্জ্বল রত্নকে নাপাকি দ্বারা পূর্ণ করা অনুচিত।

ইল্‌মই সৎপথে পরিচালিত করিবে, এ ভ্রম নিরসন ঃ কেহ হয়ত বলিবে, দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করিলেও তাহাকে দুনিয়া হইতে ফিরাইয়া লইবে। যেমন প্রাচীন কালের লোক বলিয়াছেন, "আমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করি নাই; কিন্তু স্বয়ং ইল্‌ম আমাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে লইয়া গিয়াছে।" ইহার উত্তর এই—তাঁহারা যে ইল্‌মের কথা বলিয়াছেন তাহা নিছক কুরআন হাদীসের ইল্‌ম এবং আখিরাত ও শরীয়তের ইল্‌ম ছিল। এই ইল্‌মই তাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। তাঁহাদের অন্তরও আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিয়া থাকিত এবং দুনিয়ার লোভ লালসার প্রতি তাঁহাদের মনে ঘৃণা ছিল। তদুপরি সেই যুগে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত বুযর্গের সংখ্যাও কম ছিল না। সুতরাং এই সকল বুযর্গের অনুকরণ-অনুসরণ করিবার জন্য তাঁহাদের মনে অনুরাগ জন্মিত। সেই কালে লোকেরা কুরআন-হাদীসের ইল্‌মই শিক্ষা করিত এবং যমানাও তাহাদের অনুকূল ছিল। এজন্যই লোকে আশা করিত যে, স্বয়ং ইল্‌মই ইল্‌ম-শিক্ষার্থীকে আল্লাহ্‌র দিকে পরিচালিত করিবে এবং ইল্‌ম তাহাদের মন জয় করিয়া লইবে। কিন্তু আজকাল ধর্ম-বিরোধী দর্শন, সাহিত্য তর্ক-শাস্ত্র, উপন্যাস ও চরিত্র ধ্বংসমূলক অশ্লীল প্রেম-কাহিনী অধ্যয়ন করা হইয়া থাকে। আর শিক্ষকগণও নিজ নিজ বিদ্যাকে দুনিয়া হাসিলের ফাঁদ করিয়া লইয়াছে; ভুলেও তাহাদের মন ধর্ম-কর্মের দিকে আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং তাহাদের সঙ্গ, শিক্ষা ও আদর্শ মানুষকে কখনও দুনিয়ার মোহ হইতে মুক্ত করিয়া আল্লাহ্‌র দিকে আকর্ষণ করিতে পারে না। পূর্ব যমানার লোকদের অবস্থা শোনা গিয়াছে এবং এ-যমানার বিদ্যা ও বিদ্বানদের অবস্থা দেখা গিয়াছে। শ্রুত কখনই দৃষ্টের তুল্য হইতে পারে না। এ-যমানা আর পূর্ব যমানা সমান হইতে পারে না।

আবার ভাবিয়া দেখ, এ যমানার আলিমগণ দুনিয়াদার, না দীনদার এবং তাহাদের কার্যাবলী দেখিয়া লোকের উপকার হইতেছে, না অপকার। মোটকথা, এ যমানার অধিকাংশ আলিমই দীনদার আলিম নহে এবং তাহাদের কার্যাবলী দেখিয়া ধর্মের দিক দিয়া মানব-সমাজের অপকারই হইতেছে। কিন্তু পূর্বকালের বুযর্গগণের পদাঙ্ক অনুসরণকারী মুত্তাকী পরহেযগার আলিম যদি এমন ইল্‌ম শিক্ষা দেন যাহা দুনিয়ার মোহ ও প্রতারণা হইতে ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার বর্ণনায় পরিপূর্ণ থাকে, তবে তাঁহার নিকট হইতে ইল্‌ম শিক্ষা অসীম কল্যাণকর; এমনকি এরূপ আলিমের সংসর্গও অতীব উপকারী এবং তাঁহার দর্শন-লাভও পারলৌকিক সৌভাগ্যের কারণ হইয়া থাকে। এইরূপ উপকারী ইল্‌ম শিক্ষা করা জগতের অন্যান্য যাবতীয় কাজ হইতে উত্তম।

www.BANGLAKITAB.com

কল্যাণকর ইল্‌ম ঃ যে ইল্‌ম শিক্ষা করিলে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ও আখিরাতের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, যে ইল্‌মের সাহায্যে লোকে আখিরাতে অবিশ্বাসী দুনিয়াদারদের অজ্ঞতা ও মূর্খতা বুঝিতে পারে এবং অহংকার, রিয়া, হিংসা, আত্মগর্ব, লোভ ও সংসারাসক্তির আপদসমূহ অবগত হইয়া এইগুলি দূরীকরণের উপায় জানিতে পারে, তাহাই কল্যাণকর ইল্‌ম। এইরূপ ইল্‌ম তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির পক্ষে ঠাণ্ডা পানি স্বরূপ এবং পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে ঔষধ সদৃশ। দুনিয়া-লোভী ব্যক্তি যদি এমন বিদ্যা শিক্ষা করে যাহা দুনিয়ার প্রতি মনে ঘৃণার উদ্রেক করে না, যেমন ফিকাহ্-শাস্ত্র এবং ধর্ম-বিরোধী তর্ক-শাস্ত্র, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি তবে সে এমন পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় যে কুপথ্য গ্রহণ করত পীড়া আরও বাড়াইয়া দেয়। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল শাস্ত্র হিংসা, রিয়া, গর্ব, শত্রুতা, আত্ম-প্রশংসা, প্রবঞ্চনা, প্রভুত্ব-লালসা, ধনাসক্তি প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির বীজ অন্তরে রোপণ করে। এই শাস্ত্রগুলি যত অধিক অধ্যয়ন করা যায় ততই উক্ত কুপ্রবৃত্তিসমূহ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। যাহারা ফিকাহ্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ বলিয়া দাবি করে এবং ধর্ম-বিরোধী শাস্ত্রচর্চায় মশগুল থাকে, তাহাদের সংসর্গে থাকিলে লোকে এত হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে যে, তথা হইতে তাহারা আর ফিরিয়া আসিতে পারে না এবং তওবা করিয়া ঠিক পথ অবলম্বন করাও তাহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে।

তৃতীয় অধ্যায়

পবিত্রতা

আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারিগণ ও অত্যধিক পবিত্রতা অবলম্বনকারীদিগকে ভালবাসেন।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ -

অর্থাৎ "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" হাদীস শরীফে আরও উক্ত আছে ঃ

بُنِيَ الدِّيْنُ عَلَى النَّظَافَةِ -

অর্থাৎ "পবিত্রতা ধর্মের ভিত্তি।" এই বাণীগুলির মর্ম ইহা বুঝিও না যে, শরীর ও পরিধেয় বস্ত্রের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার এইরূপ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা হইয়াছে।

পবিত্রতার শ্রেণীভেদ ঃ পবিত্রতা চারি প্রকার

প্রথম—আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত বিষয় হইতে হৃদয় পবিত্র রাখা। এই মর্মে আল্লাহ্ বলেন ঃ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ অর্থাৎ "বল, আল্লাহ্; তৎপর অন্য সব কিছু পরিত্যাগ কর।" এই নির্দেশের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছু অন্তরে স্থান না পাইলে লোকে আল্লাহ্‌র চিন্তায় ও প্রেমে লিপ্ত ও বিভোর থাকিতে পারে। ইহাই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্,' কলেমার প্রকৃত মর্ম। সিদ্দিকগণের ঈমান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছু হইতে অন্তর পাক করাকেই ঈমানের অর্ধাংশ বলা হইয়াছে; অর্থাৎ অন্তরকে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর সবকিছু হইতে পাক করাই হইল ঈমানরূপ দেহের প্রাণ। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য সবকিছু হইতে হৃদয় পাক না হওয়া পর্যন্ত ইহা তাঁহার যিকির দ্বারা সুশোভিত হওয়ার যোগ্য হয় না।

দ্বিতীয়—হিংসা, অহংকার, রিয়া, লোভ, শত্রুতা, আত্মগর্ব প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি অন্তর হইতে দূর করত তদ্‌স্থলে বিনয়, অল্পে তুষ্টি, তওবা, ধৈর্য, আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁহার

www.BANGLAKITAB.com

রহমত লাভের আশা, আল্লাহ্‌র মহব্বত ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলী অর্জন করত অন্তরকে অলংকৃত করা। মুত্তাকী লোকদের ঈমান এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এ-স্থলে অসৎ স্বভাব হইতে অন্তরকে পবিত্র করাই ঈমানের অর্ধাংশ।

তৃতীয়—গীবত, মিথ্যা কথন, হারাম, ভক্ষণ, বিশ্বাসঘাতকতা, মহ্‌রম স্ত্রীলোক-দর্শন ইত্যাদি হইতে বিরত থাকা এবং যাবতীয় পাপকর্ম হইতে হস্ত-পদ প্রভৃতি সকল বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাঁচাইয়া রাখা যেন সকল বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত কার্যে শরীয়তের আজ্ঞাধীন হইয়া পড়ে। সংসার-বিরাগিগণের ঈমান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ-স্থলে বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে সকল হারাম কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখাই ঈমানের অর্ধাংশ।

চতুর্থ—পরিধেয় বস্ত্র ও শরীরকে সকল অপবিত্রতা হইতে পাক রাখা যেন নামায আদায় করা চলে। ইহাই মুসলমানদের পবিত্রতার সর্বনিম্ন সোপান। কারণ, সাংসারিক কর্মব্যস্ততার সময় নামায দ্বারাই মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই প্রকার পবিত্রতাও ঈমানের অর্ধাংশ। সুতরাং দেখা গেল যে, চারি শ্রেণীর ঈমানের প্রত্যেকটিতেই পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। আর পবিত্রতাই ইহার প্রথমার্ধ বলিয়াই রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'পবিত্রতা ধর্মের ভিত্তি।'

শারীরিক পবিত্রতার দিকে অধিক আগ্রহের কারণ ঃ উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, শরীর ও পরিধেয় বস্ত্রের পবিত্রতা সর্বনিম্ন শ্রেণীর পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত; অথচ সকলেই এই পবিত্রতা অর্জনে তৎপর এবং ইহার জন্যই সকল চেষ্টা তদবীর করা হয়। বাহ্য পবিত্রতার দিকে লোকে এত নিবিষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, সর্বপ্রকার পবিত্রতা হইতে ইহাই সহজতম এবং প্রবৃত্তিও ইহা লাভ করিয়া আনন্দিত হয় ও আরাম বোধ করে। আবার লোকেও বাহ্য পবিত্রতাই দেখিয়া থাকে এবং ইহা দেখিয়াই মানুষকে ধর্মপরায়ণ বলিয়া মনে করে। এই সমস্ত কারণেই বাহ্য পবিত্রতা মানুষের জন্য এত সহজ হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে হিংসা, অহংকার, রিয়া, আনন্দ ও আরাম পায় না; অধিকন্তু এই আভ্যন্তরিক পবিত্রতার প্রতি অপর লোকের দৃষ্টিও পড়ে না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্‌ই ইহা দর্শন করেন, মানুষ ইহা দেখিতে পারে না। এই সমস্ত কারণেই আভ্যন্তরিক পবিত্রতা সাধনে মানুষ আগ্রহশীল হয় না।

বাহ্য পবিত্রতার ফযীলত ও শর্তাবলী ঃ বাহ্য পবিত্রতা যদিও নিম্নতম শ্রেণীর পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত তথাপি অস্‌অসার বশীভূত না হইয়া ও বাড়াবাড়ি না করিয়া যথানিয়মে সম্পন্ন করিলে ইহাতে বড় ফযীলত রহিয়াছে। বাড়াবাড়ি করিলে মকরূহ হইবে, এমন কি বাড়াবাড়িকারী পাপী হইবে। সূফীগণ বাহ্য পবিত্রতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য পাজামা পরিধান করেন, গায়ে চাঁদর ধারণ করেন এবং পানির

পবিত্রতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যে নিজেদের ব্যবহারের পানি বা পানির পাত্র অন্যকে স্পর্শ করিতে দেন না। এইগুলি উত্তম কার্য। কিন্তু ফিকাহ্ শাস্ত্রের আলিমগণ এইরূপ সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যকতা বোধ করেন না। তাই বলিয়া সূফিগণের তদ্রূপ সতর্কতার বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিবাদ করা উচিত নহে। অপর পক্ষে ফিকাহ শাস্ত্র অনুযায়ী যাহারা পবিত্রতা সাধন করে তাহাদের বিরুদ্ধেও সূফীদের প্রতিবাদ করা অনুচিত। পবিত্রতা সাধনে সতর্কতা অবলম্বন উত্তম; কিন্তু তজ্জন্য ছয়টি শর্ত মানিয়া চলা আবশ্যক।

প্রথম শর্ত ঃ বাহ্য পবিত্রতা সাধনে এতটুকু বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে, যাহার কারণে অধিক সময় নষ্ট হইয়া কোন মহৎ কার্য হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। কেহ হয়ত ইল্‌ম অর্জনে মশগুল থাকিতে পারেন, কেহ বা আধ্যাত্মিক ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে পারেন যাহাতে তাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু অধিক মাত্রায় উন্মিলিত হয়, আবার কেহ বা জীবিকা অর্জনের ক্ষমতা রাখেন এবং ইহার করিয়া নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের অভাব মোচন করিতে পারেন, পরের গলগ্রহ ও মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। পবিত্রতা সাধনে সতর্কতা অবলম্বনের দরুন অধিক সময় নষ্ট হওয়ার কারণে এই সকল কার্য হইতে যদি তাঁহাকে বঞ্চিত থাকিতে হয় তবে তাঁহার পক্ষে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত নহে। কারণ, এই সকল কার্য পবিত্রতা সাধনে সতর্কতা অবলম্বন অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। এইজন্যেই সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম বাহ্য পবিত্রতা সাধনের সতর্কতামূলক কার্যে লিপ্ত থাকিতেন না। কেননা, তাঁহারা জিহাদ, জীবিকা অর্জন, ইল্‌ম অন্বেষণ ইত্যাদি জরুরী কার্যে লিপ্ত থাকিতেন। এইজন্যই তাঁহারা নগ্ন পদে চলিতেন, যমীনের উপর নামায আদায় করিতেন, মাটির উপর বসিতেন, আহারের পর পায়ের তলায় হাত মুছিয়া লইতেন, ঘোড়া, উট প্রভৃতি বাহন-পশুর ঘামে সিক্ত হইলে ধুইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন না। অন্তরের পবিত্রতা সাধনের জন্য তাঁহারা অত্যধিক চেষ্টা করিতেন; শারীরিক পরিচ্ছন্নতার দিকে তাঁহাদের খেয়াল ছিল না। কোন ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর গুণে গুণান্বিত হইলে তৎপ্রতি বাহ্য পবিত্রতা বিষয়ক সতর্কতা অবলম্বনের প্রশ্ন উত্থাপন করা সূফিগণের পক্ষে শোভা পায় না। আবার যে ব্যক্তি অলসতা ও শিথিলতাবশত সতর্কতা অবলম্বন করে না, তাহার পক্ষে সতর্কতা অবলম্বনকারী সূফীদের প্রতি প্রতিবাদ করাও অশোভন। কারণ, সতর্কতা অবলম্বন করা সতর্কতা অবলম্বন না করা অপেক্ষা উত্তম।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ নিজকে রিয়া ও আত্মগর্ব হইতে বাঁচাইয়া রাখা কর্তব্য। কারণ, সতর্কতা অবলম্বনকারীর আপাদমস্তক প্রকাশ করিতে থাকে, "আমি সূফী দরবেশ, আমি পবিত্রতা বিষয়ে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকি।" আর এইরূপ সতর্কতার কারণে তাহারা লোকের নিকট সম্মান পায়। লোক-চক্ষে তাহাদের

www.BANGLAKITAB.com

সম্মান-লাঘব হইবে বলিয়া তাহারা নগ্ন পদ মাটিতে স্থাপন করিতে বা অপরের লোটা ব্যবহার করিতে সংকোচ বোধ করে। এইরূপ ব্যক্তির আত্মপরীক্ষা করা উচিত। লোকের সম্মুখে নগ্ন পদে চলাফেরা করিয়া ও সতর্কতা বর্জন করত জায়েয বিধান অবলম্বনপূর্বক অন্তরে গোপনে পবিত্রতা সাধনের সতর্কতা করিলে যদি তাহার মন এই ব্যবস্থার প্রতি প্রতিবাদ করিয়া বাহ্য পবিত্রতা প্রদর্শনের জন্য লালায়িত হয় তবে বুঝিতে হইবে তাহাকে রিয়া পাইয়া বসিয়াছে। এমতাবস্থায় সতর্কতা পরিত্যাগ করত খালি পায়ে চলাফেরা করা ও মাটির উপর নামায আদায় করা ওয়াজিব। কারণ রিয়া হারাম ও সতর্কতা মুস্তাহাব। সতর্কতা বর্জন না করিয়া যদি রিয়া হইতে রক্ষা না পাওয়া যায় তবে সতর্কতা বর্জন করা ওয়াজিব।

তৃতীয় শর্ত ঃ সতর্কতাকে অবশ্য-কর্তব্য করিয়া লওয়া উচিত নহে। মাঝে মধ্যে সতর্কতা বর্জন করত জায়েয পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যেমন রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক মুশরিকের বর্তন দ্বারা ওযূ করিয়াছিলেন এবং হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক মূর্তিপূজক স্ত্রীলোকের লোটায় ওযূ করিয়াছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) প্রায়ই মাটির উপর নামায পড়িতেন এবং যে ব্যক্তি বিছানা ব্যতিরেকে মাটির উপর শয়ন করিতেন তাঁহাকে খুব সম্মান করিতেন। যাহারা তাঁহাদের অভ্যাস বর্জন করে তাহারা সৌভাগ্য বঞ্চিত; তাহার ঐ সকল বুযুর্গের অনুসরণ করিবে না। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, সতর্কতা অবলম্বনে তাহাদের মন আনন্দ পায় এবং লোকচক্ষে তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি হয়। এই জন্যই সতর্কতা বর্জন তাহাদের জন্য দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে।

চতুর্থ শর্ত ঃ যে সতর্কতা অবলম্বন করিলে অপর মুসলমানের মনে দুঃখ হয় তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ, মুসলমানের মনে দুঃখ দেওয়া হারাম, সতর্কতা বর্জন হারাম নহে। কোন ব্যক্তি সালামের পর মুসাফাহা বা মুআনাকাহ্ করিবার জন্য অগ্রসর হইলে তাহার শরীরের ঘর্ম হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে সরিয়া যাওয়া হারাম। বরং শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক মুসলমানদের পরস্পর মিলন শত-সহস্র সতর্কতা হইতে উত্তম। এইরূপ একজন অপরজনের জায়নামাযে দাঁড়াইতে কিংবা লোটা দ্বারা ওযূ অথবা গ্লাসে পানি পান করিতে চাহিলে তাহাকে বাধা দেওয়া ও ঘৃণা প্রকাশ করা উচিত নহে। রাসূলে মাকবূল (সা) একবার যমযমের পানি চাইলে হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু নিবেদন করিলেন ঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সা), পূর্বোত্তোলিত পানিতে বহু লোকে হাত ডুবাইয়াছে ইহা ঘোলা হইয়া গিয়াছে। একটু অপেক্ষা করুন; আমি আপনার জন্য একটি পৃথক বালতি আনিয়া পানি উঠাইয়া দিতেছি।" হুযুর (সা) বলিলেন ঃ "না, আমি মুসলমানগণের হাতের বরকত লাভ করাকে পছন্দ করি।" লেখা-পড়া জানা বহু মূর্খ এই সকল বিষয়ের তাৎপর্য উপলব্ধি করে না এবং যে ব্যক্তি সতর্কতা অবলম্বন করে না তাহার নিকট ঘেঁষে না ও তাহার মনে ব্যথা দেয়।

এমনকি, তাহাদের মাতাপিতা ও বন্ধুবান্ধব তাহাদের লোটা বা বস্ত্র স্পর্শ করিতে চাহিলেও তাহারা কর্কশ বাক্য বলিয়া উঠে। এই সমস্তই হারাম। সতর্কতা ওয়াজিব নহে; সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করিতে যাইয়া তদ্রূপ ব্যবহার করা কিরূপে জায়েয হইতে পারে? বাহ্য পবিত্রতা সাধনে যাহারা বাড়াবাড়ি করে তাহাদের অধিকাংশের মনেই অহংকার জাগে। তাহারা যেন গর্বিত হইয়া বলে ঃ "আমরা এইরূপ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতেছি এবং সাধারণ লোকদিগকে আমাদের নিকট ঘেঁষিতে না দিয়া মনঃকষ্ট প্রদানপূর্বক তাহাদিগকে পবিত্রতার পথে চালাইতেছি।" তাহারা তাহাদের পবিত্রতার বিষয় প্রচার করিয়া নিজেদের গৌরব ঘোষণা করে এবং তদ্সঙ্গে অপরের নিন্দা করিয়া বেড়ায়। সাহাবা (রা)-গণ যে সরল পথে চলিতেন এই মূর্খগণ সেই পথ অবলম্বন করে না। এই নির্বোধগণ শুধু ঢিলা-কুলূখ দ্বারা ইস্তেঞ্জা করাকে কবীরা গুনাহ বলিয়া মনে করে। এই সমস্তই তাহাদের মন্দ স্বভাব। এমন স্বভাবের লোকের হৃদয় অপবিত্রতায় পূর্ণ। হৃদয়কে এই সকল মন্দ স্বভাব হইতে পবিত্র রাখা ফরয। কারণ, এই সমস্ত ধ্বংসের উপকরণ এবং পবিত্রতা সাধনে বাড়াবাড়ি বর্জন ধ্বংসের উপকরণ নহে।

পঞ্চম শর্ত ঃ পানাহার ও কথনে সতর্কতা অবলম্বন নিতান্ত আবশ্যক। আবশ্যক কার্য বর্জনপূর্বক অনাবশ্যক কার্যে সতর্কতা অবলম্বন করিলে হৃদয়ের অহংকার প্রমাণিত হয় অথবা এইরূপ সতর্কতা অভ্যাসগত বলিয়াই বুঝা যায়; যেমন কেহ হয়ত অল্প ক্ষুধায়ই আহার করে, ইহাতে কোনই সতর্কতা অবলম্বন করে না। অথচ আহারের পর সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক হাত-মুখ ধৌত না করিয়া নামায পড়ে না। সে অবগত নহে যে, নাপাক দ্রব্য খাওয়া হারাম। যদি নাপাকই হয় তবে অনাবশ্যক আহার করে কেন? আর পবিত্র দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া হাত-মুখ প্রক্ষালণের জন্য এত বাড়াবাড়ি কেন? হাত-মুখ তো ধৌত করিল, কিন্তু সর্বসাধারণের জায়নামাযে নামায পড়ে না কেন? আবার সর্বসাধারণের গৃহে প্রস্তুত খাদ্য আগ্রহ সহকারে আহার করে কেন? এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে না কেন? অথচ খাদ্যদ্রব্যের পবিত্রতা বিষয়ে সতর্কতা নিতান্ত আবশ্যক। ঐরূপ অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি যাহারা করে তাহাদের অধিকাংশই বাজারে প্রস্তুত খাদ্য দোকানে বসিয়াই গলধঃকরণ করে; কিন্তু সেই দোকানদারদের বিছানায় নামায পড়ে না। এইরূপ ব্যক্তি সতর্কতা অবলম্বনে খাঁটি বলিয়া প্রমাণিত হয় না।

ষষ্ঠ শর্ত ঃ সতর্কতা অবলম্বন করিতে যাইয়া কোন হারাম কার্য সংঘটিত না হয় তৎপ্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যেমন, সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক তিনবারের অধিক কোন অঙ্গ ধৌত করা সঙ্গত নহে; কারণ, তিন বারের অধিক ধৌত করা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ ওযূ-গোসলে বিলম্ব করিয়া অধিক সময় ক্ষেপণ করাও উচিত নহে। কেননা, অপর মুসলমান তাহার প্রতীক্ষায় থাকিতে পারে। অধিক পরিমাণে পানি অপচয়

www.BANGLAKITAB.com

করাও নিষেধ। সন্দেহের কারণে একই অঙ্গ বারবার ধৌত করত সময় নষ্ট করিয়া বিলম্বে নামায পড়াও সঙ্গত নহে। এইরূপ শূচিবায়ুগ্রস্ত হইয়া মুক্তাদীদিগকে জামাআতের জন্য আটকাইয়া রাখাও ইমামের উচিত নহে। কোন মুসলমানের সহিত কোন বিষয়ে ওয়াদা করিয়া তাহা পূরণ করিতে ওযূ-গোসলের বাড়াবাড়ির জন্য বিলম্ব করিলে সময় নষ্ট হওয়ার দরুন সে ব্যক্তি জীবিকা অর্জনে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এবং এই কারণে তাহার পরিবার-পরিজন কষ্ট পাইতে পারে। অনাবশ্যক সতর্কতা অবলম্বনের জন্য এই প্রকার কাজ কখনও জায়েয হইতে পারে না। অন্যের বস্তু শরীরে লাগিবে বলিয়া নিজের জায়নামায মসজিদে খুব প্রশস্ত করিয়া বিছাইয়া লওয়াও সঙ্গত নহে। তিন কারণে ইহা নিষিদ্ধ (১) সিজদার জন্য আবশ্যক পরিমাণ স্থান প্রত্যেক মুসল্লীরই প্রাপ্য। প্রশস্ত করিয়া জায়নামায বিছাইলে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক স্থান অপর মুসল্লী হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। (২) কাতারে নামাযীর কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়ান সুন্নত। কিন্তু তদ্রূপ জায়নামায বিছাইলে উভয় পার্শ্বে ফাঁক থাকিয়া যায়। (৩) নিজের শরীর ঘেঁষিয়া অপর নামাযীকে দাঁড়াইতে না দিলে বুঝা যায় যে, অন্যান্য নামাযীকে কুকুর ও অপরাপর নাপাক বস্তুর ন্যায় পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে করা হয়। ইহা নিতান্ত অনুচিত। আলিম-মূর্খদের এমন এক দল লোক আছে যাহারা বাহ্য পবিত্রতা বিধানে বাড়াবাড়ি করিতে যাইয়া এই প্রকার বহু গর্হিত কার্য করিয়া থাকে এবং এইগুলিকে নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করে না।

উপরের বর্ণনা হইতে জানা গেল যে, বাহ্য পবিত্রতা হইতে আভ্যন্তরিক পবিত্রতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আভ্যন্তরিক পবিত্রতা তিন প্রকার ঃ (১) শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে পাপ হইতে পবিত্র রাখা; (২) মন্দ স্বভাব হইতে হৃদয়ের প্রকাশ্য অংশ পবিত্র রাখা এবং (৩) হৃদয়ের অভ্যন্তর ভাগকে এক আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর চিন্তা হইতে পবিত্র রাখা। এখন অবগত হও যে, বাহ্য পবিত্রতাও তিন প্রকার, (১) মলমূত্রাদি, নাপাক জিনিস হইতে শরীর পবিত্র রাখা, (২) ওযূ ভঙ্গ এবং স্ত্রী-সঙ্গম ও শুক্রপাতের কারণে শরীর অপবিত্র হইলে ওযূ-গোসল দ্বারা পবিত্রতা অবলম্বন এবং (৩) নখ, কেশ, ময়লা প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ শরীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় উহা দূর করত শরীর পবিত্র করা।

মলমূত্রাদি হইতে পবিত্রতা ঃ জড় পদার্থের ন্যায় যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন উহার সবগুলিই পবিত্র। কিন্তু মদ যাহা পান করিলে নেশা হয়, তাহা অল্পই হউক আর বেশিই হউক অপবিত্র। কুকুর ও শূকর ব্যতীত সমস্ত প্রাণীই পাক। সমস্ত মৃত প্রাণীই নাপাক কিন্তু মানুষ, মাছ ও টিড্ডী (একপ্রকার ফড়িং যাহা ফসল নষ্ট করে), প্রবহমান রক্তবিহীন প্রাণী যেমন মাছি, মৌমাছি, বিচ্ছু এবং খাদ্যশস্যে উৎপন্ন কীটের মৃতদেহ অপবিত্র নহে। যে বস্তু উদরে গিয়া রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হইয়া

গিয়াছে উহার সমস্তই নাপাক; কিন্তু যাহা প্রাণীদেহের মূল যেমন শুক্র, (হানাফী মযহাব মতে প্রাণীর শুক্রও অপবিত্র), পাখির ডিম ও রেশমকীট অপবিত্র নহে। যে সমস্ত বস্তু রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত না হইয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া আসে তাহা, যেমন ঘাম ও চোখের পানি অপবিত্র নহে। অপবিত্র পদার্থ সঙ্গে লইয়া নামায দুরস্ত নহে। কিন্তু পাঁচ প্রকার ময়লা সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভব নহে বলিয়া ক্ষমার যোগ্য—(১) পায়খানার পর তিনটি প্রস্তর-খণ্ড বা তিনটি ঢিলা দ্বারা তিনবার ভালরূপে মুছিয়া ফেলার পরও যদি মল দ্বারে সামান্য মাত্র চিহ্ন থাকিয়া যায় এবং তদতিরিক্ত স্থানে বিস্তৃত না থাকে; (২) সড়কের কর্দম—যদিও ইহাতে নিঃসন্দেহরূপে মল-মূত্রাদি মিশ্রিত থাকে; কিন্তু সাধ্যানুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও যতটুকু হইতে রক্ষিত থাকা যায় না কেবল ততটুকুই মার্জনীয়। ইহাতে এইরূপ মনে করিও না যে, সড়কের কর্দমের উপর আছাড় পড়িলে অথবা হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তু কর্তৃক উক্ত সড়ক হইতে তোমার কাপড়ে কর্দম নিক্ষিপ্ত হইলে সে কাপড়ে নামায পড়া দুরস্ত হইবে। এইরূপ কদাচিৎ ঘটিয়া থাকিলেও দুরস্ত হইবে না। (৩) চলা-ফেরার সময় রাস্তার অপবিত্রতা হইতে পায়ের মোজা সম্পূর্ণরূপে বাঁচাইয়া রাখা যায় না। যতটুকু হইতে বাঁচানো অসম্ভব ততটুকু মোজায় লাগিয়া গেলে উহা মাটিতে ঘষিয়া তৎসহ নামায পড়িলে মার্জনীয় হইবে। (৪) চাম উকুন, চারপোকা, ডাঁশ প্রভৃতি কীটের রক্ত কাপড়ে লাগিলে ইহা লইয়া নামায দুরস্ত হইবে। উহার রস নির্গত হইলেও জায়েয হইবে। (৫) শরীরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোটা বাহির হয় তাহা হইতে সামান্য লালাভ রস বাহির হইলে তৎসহ নামায পড়িলেও মার্জনীয় হইবে। কারণ, এইরূপ গোটা হইতে মানব-শরীর মুক্ত থাকে না। এইরূপে খোস-পাঁচড়া হইতে যে পরিষ্কার রস নির্গত হয় তাহাও মার্জনীয়। কিন্তু যে গোটা বড় তাহা হইতে পুঁজ বাহির হয়। ইহাকে ফোঁড়ার তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে। এইরূপ গোটা কম হইয়া থাকে। ইহা হইতে নির্গত পুঁজ ধুইয়া ফেলা ওয়াজিব। সতর্কতার সহিত ধুইয়া ফেলার পরও যদি সামান্য চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে তবে উহা মাফ হওয়ার আশা আছে। কোন শিরা কাটিয়া শরীরের দূষিত রক্ত বাহির করিলে বা কোন যখম হইতে রক্ত নির্গত হইলে উহা ধুইয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু ধুইবার পরও যদি ক্ষতস্থানে কিছু রক্ত থাকিয়া যায় এবং ইহা ধুইবার জন্য বাড়াবাড়ি করিলে পীড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে তবে এমতাবস্থায় নামায না পড়িয়া পরে কাযা আদায় করিবে, কারণ এমন অবস্থা নিতান্ত বিরল।

যে স্থানে নাপাক জিনিস লাগিয়াছে, একবার পানি প্রবাহিত করিয়া উহা ধুইয়া ফেলিলে পাক হইয়া যাইবে। কিন্তু সেই নাপাক জিনিস প্রকৃতিগত নাপাক হইলে সে স্থানটি এমনভাবে ধুইতে হইবে যাহাতে ময়লা নিঃশেষে বিদূরিত হয়। কিন্তু ধৌত ও ঘর্ষণ করিলে এবং নখ দ্বারা কয়েকবার আঁচড়াইলেও যদি উহার বর্ণ ও গন্ধ অবশিষ্ট থাকে তবে সেই স্থান পাক বলিয়া গণ্য হইবে।

www.BANGLAKITAB.com

চারি প্রকার পানি ব্যতীত আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সমস্ত পানিই পাক এবং অপর বস্তুকে পাক করিতে পারে। (১) ওযূ-গোসলে একবার ব্যবহৃত পানি নিজে পাকই থাকে; কিন্তু ইহা অপরকে পাক করিতে পারে না। (২) যে পানি দ্বারা মলমূত্রাদি বা কোন নাপাক বস্তু ধৌত করা হইয়াছে তাহা নিজেও পাক নহে এবং অপরকেও পাক করিতে পারে না। কিন্তু উক্ত ধৌত নাপাকী যদি পানির সহিত মিশ্রিত হইয়া পানির স্বাভাবিক বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন করিয়া না ফেলে তবে সে পানি নিজে পাক; (অবশ্য অপরকে পাক করিতে পারে না।) (৩) হযরত ইমাম শাফেঈ (র)-এর মতে আড়াইশত সের অপেক্ষা কম পানিতে মলমূত্রাদির ন্যায় কোন নাপাক বস্তু পতিত হইলে পানির বর্ণ স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন না হইলেও উহা নাপাক। কিন্তু আড়াইশত সের বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ পানির সহিত মলমূত্রাদি বা নাপাক বস্তু মিশিয়া যতক্ষণ উহার বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন না হয় ততক্ষণ উহা নাপাক হয় না। (৪) জাফরান, সাবান, আশনান-পাতা, আটা প্রভৃতি পাক বস্তু যাহা হইতে পানিকে পৃথক করা চলে, পানির সহিত মিশিয়া পানির বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত হইলে পানি পাকই থাকে; কিন্তু অপরকে পাক করিতে পারে না। তবে উক্ত গুণগুলির সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়া থাকিলে এরূপ পানি দ্বারা অন্য বস্তুকে পাক করাও যাইতে পারে।

ওযূ-গোসল দ্বারা পবিত্রতা ঃ ওযূ ভঙ্গ এবং স্ত্রী সঙ্গম ও শুক্রপাতের কারণে শরীর অপবিত্র হইলে ওযূ-গোসল দ্বারা পবিত্রতা সাধন করিতে হয়। এ সম্বন্ধে পাঁচটি বিষয় জানিয়া রাখা আবশ্যক, (১) মলমূত্র ত্যাগের নিয়ম, (২) মলমূত্র-দ্বার পাক করিবার নিয়ম (৩) ওযূর নিয়ম (৪) গোসলের নিয়ম এবং (৫) তায়াম্মুম করার নিয়ম।

মলমূত্র ত্যাগের নিয়ম ঃ উন্মুক্ত ময়দানে মলত্যাগের প্রয়োজন হইলে লোকচক্ষুর অন্তরালে বহু দূরে যাইয়া বসা উচিত। সম্ভব হইলে কোন কিছুর আড়ালে বসাই শ্রেয়। বসিবার পূর্বে লজ্জাস্থান অনাবৃত করা উচিত নহে। চন্দ্র বা সূর্যের দিকে মুখ করিয়া বসিবে না; কিন্তু পায়খানা হইলে এরূপ বসাতে আপত্তি নাই। কিবলা শরীফের দিকে মুখ বা পৃষ্ঠ রাখিয়া বসিবে না। কাবা শরীফকে ডানে বা বামে রাখিয়া আড়াআড়ি বসাই উত্তম। যে স্থানে জনসমাগম হয় সে স্থানে পায়খানা-পেশাব করিবে না। পানিতে দণ্ডায়মান হইয়া পেশাব করিবে না। ফলবান বৃক্ষের নিচে পায়খানা-পেশাব করিবে না। শক্ত মাটির উপর ও বাতাসের গতির বিপরীতমুখী হইয়া পেশাব করিবে না। করিলে শরীরে পেশাবের ছিটা পড়িতে পারে। বিনা ওযরে দাঁড়াইয়া পেশাব করিবে না। ওযূ-গোসলের স্থানে পেশাব করিবে না। বাম পায়ে ভর দিয়া বসিবে। পায়খানায় প্রবেশের সময় বাম পা আগে স্থাপন করিবে এবং বাহির হইবার সময় ডান পা আগে বাহির করিবে। আল্লাহ্‌র নাম খোদিত আছে এমন কোন জিনিস সাথে লইয়া পায়খানায় যাইবে না। খালি মাথায় পায়খানা-পেশাব করিতে যাইবে না। পায়খানায় যাইবার সময় এই দু'আ পড়িবে।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجْسِ الْخَبِيْثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

অর্থাৎ, "বিতাড়িত শয়তান হইতে আমি অপবিত্রতা, মলিনতা বিষয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" পায়খানা হইতে বাহির হইয়া বলিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى مَا يُؤْذُوْنَنِى وَ اَبْقَى فِىْ جَسَدِىْ مَا يَنْفَعُنِى -

অর্থাৎ, "সমস্ত প্রশংসাই সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমা হইতে কষ্টদায়ক পদার্থ বাহির করিয়া দিয়াছেন এবং আমার জন্য যাহা উপকারী তাহা আমার শরীরে রাখিয়া দিয়াছেন।"

মলমূত্র ত্যাগের পর পবিত্র হওয়ার নিয়ম ঃ পায়খানায় যাইবার সময় তিনটি প্রস্তরখণ্ড অথবা মাটির ঢিলা সঙ্গে লইবে। মলত্যাগের পর একটি ঢিলা বাম হাতে লইয়া মলদ্বারের নিকটস্থ পরিষ্কার স্থানে রাখিয়া মলযুক্ত স্থানের উপর দিয়া এমনভাবে আস্তে আস্তে টানিয়া আনিবে এবং কিছু কিছু ঘুরাইতে থাকিবে, যাহাতে মল ঢিলাতে লাগিয়া উঠিয়া যায় এবং অন্য পরিষ্কার স্থানে না লাগে। এইরূপে তিনটি ঢিলা দ্বারা তিনবার মুছিয়া ফেলিবে। ইহাতে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার না হইলে আরও দুইটি ঢিলা উত্তমরূপে ব্যবহার করিবে। ব্যবহৃত ঢিলার সংখ্যা বেজোড় হওয়া উচিত। তৎপর বড় একখণ্ড পাথর বা মাটির ঢিলা ডান হাতে লইবে এবং বাম হাতে পুরুষাঙ্গ ধরিয়া ইহার মুখ উক্ত ঢিলার তিন স্থানে তিনবার চাপিয়া ধরিবে অথবা দেওয়ালে ঐরূপ তিনবার চাপিয়া ধরিবে। পুরুষাঙ্গ বাম হাতে ধরিয়া হেলাইবে, ডান হাতে নহে। মলমূত্র ত্যাগের পর পাক হওয়ার জন্য এতটুকু করিলেই যথেষ্ট। তবে ঢিলা ব্যবহারের পর পানি দ্বারা শৌচ করা ভাল। শৌচ করিবার সময় মলত্যাগের স্থান হইতে একটু সরিয়া বসিবে যেন পরিত্যক্ত মলের উপর পানি না পড়ে। ডান হাতে পানি ঢালিবে এবং বাম হাতের আঙ্গুলের তালু দ্বারা আস্তে আস্তে ঘষিবে যেন ময়লার চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়। পরিষ্কার হইয়াছে বলিয়া বুঝিলে আর পানি ঢালিবে না। আঙ্গুল দ্বারা ঘষিবার কালে মলদ্বারের ভিতরে পানি প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিবে না। কিন্তু শৌচ-কর্ম করিবার সময় মলদ্বার ঢিলা রাখিবে। ঢিলা রাখিয়া শৌচ-কর্ম করিলে যে স্থানে পানি প্রবেশ না করে তাহা শরীরের ভিতরের অঙ্গ। উহা ধুইবার জন্য আদেশ করা হয় নাই। এইরূপ পেশাবের পর পুরুষাঙ্গের নিচে অঙ্গুলি স্থাপনপূর্বক তিনবার ঝাড়িবে, তিন কদম চলিবে এবং তিনবার গলা খাকরাইবে। সন্দেহ করিতে যাইয়া ইহার

www.BANGLAKITAB.com

অতিরিক্ত নিজের উপর কষ্ট চাপাইবে না। এরূপ করার পরও আর্দ্রতা অনুভূত হইলে অঙ্গের উপর পানি ঢালিয়া দিবে; তখন উহাকে পানির আর্দ্রতা বলিয়াই মনে হইবে। কারণ, রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সন্দেহ দূর করিবার জন্য এরূপ নির্দেশই প্রদান করিয়াছেন। মলত্যাগের পর তদ্রূপ পবিত্রতা সাধন করতে প্রাচীর-গাত্রে বা মাটিতে হাত ঘর্ষণ করিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে যেন কোন প্রকার গন্ধ না থাকে। পেশাব-পায়খানা করত পরিচ্ছন্নতা লাভের পর এই দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَ حَصِّنْ فَرْجِىْ مِنَ الْفَوَاحِشِ -

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্, মুনাফেকী হইতে আমার অন্তরকে পবিত্র রাখ এবং আমার লজ্জাস্থানকে কুকর্ম হইতে রক্ষা কর।"

ওযূর নিয়ম ঃ উক্ত নিয়মে ইস্তেঞ্জার পর মিস্ওয়াক করিবে। ডানদিক হইতে মিসওয়াক আরম্ভ করিবে। প্রথমে উপরের মাড়ির এবং তৎপর নিচের মাড়ির দাঁতগুলি মাজিবে। ইহার পর বাম পার্শ্বে ঐরূপ মিসওয়াক করিবে। দাঁতের বাহিরের দিকে মিসওয়াক করা হইয়া গেলে ঐরূপে দাঁতের ভিতরের দিকেও মিসওয়াক করিবে। তৎপর জিহ্বা এবং তালুকে মিসওয়াক দ্বারা ঘষিয়া ফেলিবে। মিসওয়াক করাকে নিতান্ত জরুরী বলিয়া মনে করিবে। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, মিসওয়াক করিয়া যে নামায পড়া হয় তাহার এক রাকআত বিনা মিসওয়াকের সত্তর রাকআত অপেক্ষা উত্তম। মিসওয়াক করিবার সময় নিয়ত করিবে, আল্লাহ্র যিকির করিবার উপকরণ পরিষ্কার করিতেছি। ওযূ ভঙ্গ হওয়া মাত্রই আবার ওযূ করিয়া লইবে। কেননা রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এইরূপই করিতেন। ওযূ করিবার সময় মিসওয়াকও করিবে। কিছু পানাহারের পর কুলি না করিয়া নিদ্রা গেলে, দীর্ঘ সময় মুখ বন্ধ করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিলে অথবা গন্ধযুক্ত কোন দ্রব্য আহার করিলে যদি মুখের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তবে ওযূ না করিলেও মিসওয়াক করা সুন্নত।

মিসওয়াক করার পর ওযূর উদ্দেশ্যে কিবলার দিকে মুখ করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে বসিয়া বলিবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَعُوْذُبِكَ مِن هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ -

অর্থাৎ, "পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করিতেছি। হে প্রভো, শয়তানের সর্বপ্রকার ধোঁকা হইতে বাঁচিবার জন্য তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং হে

প্রভো, শয়তান যেন আমার নিকট ঘেঁষিতে না পারে তজ্জন্য আমি তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" ইহার পর উভয় হাত কব্জী পর্যন্ত তিনবার ধুইবে এবং বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشُّوْمِ وَالْهَلَكَةِ -

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্, নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট শান্তি ও মঙ্গল চাহিতেছি এবং কর্তব্যে শিথিলতাজনিত দুর্ভাগ্য ও বিনাশ হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" পবিত্রতা লাভ করত নামায পড়িবার যোগ্যতা অর্জনের নিয়ত করিবে এবং মুখ ধোয়া পর্যন্ত এই নিয়তের খেয়াল রাখিবে। তৎপর গর্গরার সহিত তিনবার কুলি করিবে; কিন্তু রোযাদার হইলে গর্গরা করিবে না। এই সময় বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَتِلَاوَةِ كِتَابِكَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তোমার যিকির, তোমার শোক্র ও তোমার কিতাব তিলাওয়াত করিতে আমাকে সাহায্য কর।" অতঃপর তিনবার নাকে পানি দিবে এবং বাম হাতে নাক ঝাড়িয়া ফেলিবে ও বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِى رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنِّى رَاضٍ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকা অবস্থায় আমাকে বেহেশতের সুঘ্রাণ লইতে দাও।" ইহার পর সমস্ত মুখমণ্ডল তিনবার ধুইবে এবং বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ بِنُوْرِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ اَوْلِيَائِكَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, যেদিন তোমার বন্ধুগণের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে সেদিন তোমার নূর দ্বারা আমার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিও।" মুখমণ্ডলে যে সমস্ত চুল থাকে উহার গোড়ায় পানি পৌঁছাইবে। দাঁড়ি খুব ঘন ও মলিন হইলে উহার উপর পানি ঢালিবে এবং আঙ্গুল ঢুকাইয়া খিলাল করিবে। ইহাকে তাখলীল বলে। কপালের উপরিভাগে চুলের উৎপত্তিস্থান হইতে নিচের দিকে থুতি (গলনালী) পর্যন্ত এবং প্রস্থে এক কর্ণমূল হইতে অপর কর্ণমূল পর্যন্ত মুখমণ্ডলের সীমা। চক্ষুকোটর আঙ্গুল দ্বারা পরিষ্কার করিবে যেন পিচুটি, সুরমা ইত্যাদির চিহ্ন দূর হইয়া যায়।

অতঃপর ডান হাত কনুই পর্যন্তই তিনবার ধুইবে। উপরে কনুইর শেষ সীমা পর্যন্ত ধৌত করা উত্তম। এই সময় বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِى كِتَابِى بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, আমার আমলনামা আমার ডান হাতে প্রদান করিও এবং আমার হিসাব-নিকাশ সহজভাবে করিও। তৎপর বাম হাতও তদ্রূপ ধুইবে এবং

www.BANGLAKITAB.com

আঙ্গুলে আঙটি থাকিলে নাড়িয়া ইহার নিচে পানি পৌঁছাইবে। বাম হাত ধুইবার সময় বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اعُوْذُبِكَ اَنْ تُعْطِيَنِى كِتَابِىْ بِشِمَالِى اَوْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, আমার আমলনামা আমার বাম হাতে বা আমার পশ্চাদ্দিক হইতে দিও না। আমি এ বিষয়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি।" তৎপর হাত পুনরায় ভিজাইয়া আঙ্গুলগুলি মাথায় মাথায় মিলাইয়া কপালের উপর হইতে চুলের উপর দিয়া পশ্চাদ্দিকে গ্রীবা পর্যন্ত টানিয়া নিবে। অতঃপর তথা হইতে সম্মুখের দিকে পূর্বস্থানে আবার টানিয়া আনিবে। ইহাতে চুলের উভয় পার্শ্বই মোছা হইবে। এতটুকু করিলে একবার মসেহ হইল। এইরূপে তিনবার করিবে যেন প্রত্যেক বারই সম্পূর্ণ মাথা মোছা হয়।[১] মুছিবার সময় এই দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ غَشِّنِىْ بِرَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّكَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তোমার অনুগ্রহে আমাকে ঢাকিয়া লও এবং তোমার বরকতসমূহ আমার প্রতি অবতীর্ণ কর। আর যেদিন তোমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়াই থাকিবে না সেদিন তোমার আরশের নিচে আমাকে ছায়া প্রদান করিও।" অতঃপর উভয় কান মসেহ করিবে। তর্জনীর অগ্রভাগ কানের ছিদ্রে তিন বার ঢুকাইয়া দিবে ও কানের পেঁচে পেঁচে আঙ্গুলের অগ্রভাগ ঘুরাইবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর পেট দ্বারা উভয় কানের পৃষ্ঠদেশ পিছন হইতে সামনের দিকে মুছিয়া আনিবে। কান মসেহ করিবার সময় এই দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, যাহারা উপদেশবাণী শ্রবণ এবং তন্মধ্যে সদুপদেশসমূহ মানিয়া চলে আমাকে তাহাদের দলভুক্ত কর।" তৎপর উভয় হাতের পৃষ্ঠ দ্বারা গ্রীবা মুছিবে এবং বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ السَّلاَسِلِ وَ الْاَغْلاَلِ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, দোযখের আগুন হইতে আমার গ্রীবাকে বাঁচাইয়া রাখ এবং শিকল ও বেড়ি পরানো হইতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।" তৎপর ডান

(১) হানাফী মাযহাব মতে বৃদ্ধা ও তর্জনী ব্যতীত অন্য আঙ্গুলগুলি মাথায় মিলাইয়া উক্ত নিয়মে মাথার উপরিভাগ মসেহ করিতে হয়। তৎপর দুই হাতের তালু দ্বারা মাথার উভয় পার্শ্ব পশ্চাদ্দিক হইতে মুছিয়া সম্মুখের দিকে আনিতে হয়। এইরূপে মাথা একবারই মসেহ করিতে হয়; তিনবার নহে।

পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধুইবে। বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুলগুলির ফাঁকে ফাঁকে নিচের দিক হইতে চালাইয়া খিলাল করিবে এবং ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল হইতে খিলাল শুরু করিয়া বাম পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে যাইয়া শেষ করিবে। ডান পা ধুইবার সময় এই দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِىَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ فِى النَّارِ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, যেদিন গুনাহ্গারদের পাসমূহ পুলসিরাতের উপর হইতে পিছলাইয়া দোযখে পতিত হইবে, সেদিন পুলসিরাতের উপর আমার পা স্থির রাখিও।" তৎপর উক্ত নিয়মে বাম পা ধুইবে এবং বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُبِكَ اَنْ تَزِلَّ قَدَمِىَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ اقْدَامُ الْمُنَافِقِيْنَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, যেদিন মুনাফিকদের পাসমূহ পুলসিরাত হইতে পিছলাইয়া পড়িবে সেদিন পুলসিরাতের উপর হইতে আমার পা যেন স্খলিত না হয় তজ্জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। ওযূ শেষ হইলে বলিবে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ -

অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ্, আমাকে তওবাকারীদের শ্রেণীভুক্ত কর, আমাকে পবিত্র লোকদের দলভুক্ত কর এবং আমাকে তোমার নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর।"

যাহারা আরবী বুঝে না ঐ দু'আগুলির অর্থ তাহাদের জানিয়া লওয়া উচিত যেন তাহাদের উক্তির মর্ম তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে। হাদীস শরীফে উক্ত আছে, "যে ব্যক্তি ওযূ করিবার সময় আল্লাহ্র যিকির করে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সকল গুনাহ্ ধুইয়া মুছিয়া যায়।" ওযূর সময় দু'আ না পড়িলে কেবল ধৌত অঙ্গগুলিই পবিত্র হয়। ওযূ ভঙ্গ না হইলেও প্রত্যেক নামাযের জন্য নূতন ওযূ করিয়া লইবে। কারণ হাদীসে উক্ত আছে, যে ব্যক্তি তাজা ওযূ করে আল্লাহ্ তাহার ঈমান তাজা করিয়া দেন। ওযূ যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়া মনে করিবে, হাত মুখ প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ পবিত্র করা হইল সেগুলি মানুষে দেখিবার বস্তু। কিন্তু আল্লাহ্র খাস লক্ষ্যস্থল হইল অন্তঃকরণ।

www.BANGLAKITAB.com

বাহ্য পবিত্রতা সাধনের পরও যে ব্যক্তি তওবা করত অন্তঃকরণ পবিত্র করে না তাহাকে এমন লোকের সহিত তুলনা করা যায়, যে বাদশাহ্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহার বসিবার স্থান অর্থাৎ ঘরের মেঝের আবর্জনা পরিষ্কার না করিয়া কেবল বাহিরের দ্বার পরিষ্কার করিয়া রাখে।

ওযূর মাকরূহসমূহ ঃ ওযূর মধ্যে ছয়টি কাজ মাকরূহ—(১) দুনিয়ার কথা বলা, (২) মুখের উপর থপ্‌থপ্‌ করিয়া পানি নিক্ষেপ করা, (৩) হাত খুব জোরে ঝাড়া দেওয়া, (৪) রৌদ্রে উত্তপ্ত পানি দ্বারা ওযূ করা, (৫) প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যয় করা ও (৬) কোন অঙ্গ তিনবারের অধিক ধৌত করা। ওযূর পর ভিজা মুখমণ্ডলে যেন ধূলাবালি না আটকায় এই উদ্দেশ্যে মুখ মুছিয়া ফেলা অথবা ইবাদতের প্রভাব যেন অনেকক্ষণ অবশিষ্ট থাকে এই নিয়তে মুখ না মোছা, উভয়ই দুরস্ত আছে। আবার নিয়ত অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে ফযীলতও আছে। ধাতুনির্মিত লোটা-বদনা অপেক্ষা মাটির লোটা-বদনা ওযূর জন্য উত্তম। কারণ, তাহাতে নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ পায়।

গোসলের বিবরণ

স্ত্রীসঙ্গম করিলে অথবা স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় শুক্রপাত হইলে গোসল ওয়াজিব হয়।

গোসলের ফরয ঃ (১) সমস্ত শরীর ধৌত করা, (২) লোমকূপ পর্যন্ত পানি পৌঁছাইয়া দেওয়া ও (৩) নাপাকী হইতে পাক হওয়ার নিয়ত করা।

গোসলের সুন্নত ঃ প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়া; উভয় হাত তিনবার ধৌত করা; দেহের যে যে স্থানে নাপাকী লাগিয়াছে তাহা ধুইয়া ফেলা; উপরে বর্ণিত প্রণালীতে ওযূ করা; কিন্তু গোসলের পর পা ধুইবে। গোসলের সময় তিনবার ডান দিকে, তিনবার বাম দিকে এবং তিনবার মাথার উপর পানি ঢালিবে। যে পর্যন্ত হাতে নাগাল পাওয়া যায় সে পর্যন্ত শরীর মলিবে। শরীরের যে স্থান বন্ধ বা গুপ্ত আছে তথায় পানি পৌঁছাইবার জন্য যথাযথ চেষ্টা করিবে; কারণ ইহা ফরয। লজ্জাস্থানে হাত দিয়া তোয়ালিয়াদির সাহায্যে মলিয়া দিবে।

তায়াম্মুমের বিবরণ

তায়াম্মুম দুরস্ত হওয়ার কারণ ঃ পানি একেবারে না মিলিলে, অথবা যে পানি পাওয়া যায় তাহা বন্ধুবর্গসহ পানের আবশ্যক হইলে, কিংবা পানি পর্যন্ত যাওয়ার পথে হিংস্রজন্তু বা শত্রুর ভয় থাকিলে অথবা অন্যের অধিকারের পানি বিক্রয় না করিলে বা অতিরিক্ত মূল্য চাহিলে কিংবা পানি ব্যবহার করিলে শরীরে কোন ক্ষত বা পীড়া বৃদ্ধি পাওয়ার বা প্রাণনাশের আশংকা থাকিলে—এই সকল অবস্থায় নামাযের সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তায়াম্মুম করিতে হয়।

তায়াম্মুমের নিয়ম ঃ তায়াম্মুমের প্রয়োজন হইলে উভয় হস্তের আঙ্গুলগুলি ফাঁক রাখিয়া পাক মাটিতে এইরূপ চাপড় মারিবে যাহাতে ধূলা উড়িয়া আঙ্গুলের ফাঁকে প্রবেশ করে। তায়াম্মুমের সময় নামাযের জন্য পবিত্রতা লাভের নিয়ত করিবে। তৎপর উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মুছিবে। চুল ও লোমকূপের মধ্যে ধূলি পৌঁছাইবার জন্য অতিরিক্ত চেষ্টা করিবে না। আঙ্গুলে আংটি থাকিলে খুলিয়া রাখিবে। অতঃপর আঙ্গুল ফাঁক রাখিয়া পুনরায় মাটির উপর চাপড় মারিবে। এবার হাত উঠাইয়া বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত অন্যান্য আঙ্গুল উপর ডান হাতের আঙ্গুলের পৃষ্ঠ স্থাপন করত বাম হাতের আঙ্গুলের পেট দ্বারা ডান হাতের আঙ্গুলগুলির পৃষ্ঠদেশের অগ্রভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে মুছিয়া কনুইর উপর পর্যন্ত আনিবে। ইহার পর তথা হইতে বাম হাতের তালু ডান হাতের ভিতর ভাগে কনুইর উপর হইতে আঙ্গুলের দিকে মুছিয়া অবশেষে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পেট দ্বারা ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পৃষ্ঠ মুছিয়া ফেলিবে। এ নিয়মে ডান হাত দ্বারা বাম হাত মুছিবে। তৎপর উভয় হাতের তালু পরস্পর ঘর্ষণ করিবে এক হাতের আঙ্গুলের অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে প্রবেশ করাইয়া ঘর্ষণ করিবে। এই পর্যন্ত হাত সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য একবারের চাপড়েই চলিতে পারে। কিন্তু ইহাতে না কুলাইলে একাধিক চাপড় মারা যাইতে পারে। কারণ, কনুই পর্যন্ত হাতের সমস্ত স্থানে ধূলি লাগান আবশ্যক। এইরূপে একবার তায়াম্মুম করিয়া এক ওয়াক্তের ফরয নামায এবং সুন্নত ও নফল নামায যত ইচ্ছা পড়া যাইতে পারে। কিন্তু অন্য ওয়াক্তের ফরয নামাযের জন্য যত ইচ্ছা তায়াম্মুম করিতে হইবে।

তৃতীয় প্রকারের শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ঃ শরীরের অতিরিক্ত পদার্থ হইতে শরীর পবিত্র রাখা। ইহা দুই প্রকার—(ক) মাথার চুল ও দাড়িতে সঞ্চিত ময়লা দূর করা। চিরুণী, পানি, মাটি ও গরম পানি দ্বারা এরূপ ময়লা দূর করা চলে। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ গৃহে অবস্থানকালে ও প্রবাসে সকল সময়ই চিরুণী সঙ্গে রাখিতেন। নিজ দেহ ময়লা ও মলিনতা হইতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সুন্নত। (খ) চক্ষু-কোণের পিচুটি, কর্ণকুহরের ময়লা, নাসারন্ধ্রদ্বয়ের শ্লেষ্মা প্রভৃতি পরিষ্কার করা উচিত। নাসিকায় যে ময়লা জমাট বাঁধিয়া সঞ্চিত হয়, তাহা পানি দ্বারা পরিষ্কার করা আবশ্যক। দাঁতের ময়লা মিসওয়াক দ্বারা ঘষিয়া কুলি করিয়া দূর করিবে। হাত-পায়ের নখের ভিতরে ও বাহিরে, গুম্ফ, কবরী ও সমস্ত দেহে যে ময়লা সঞ্চিত হয় তাহাও পরিষ্কার করা উচিত। শরীরের কোন স্থানে জমিয়া চর্ম পর্যন্ত পানি পৌঁছিতে বাধা না জন্মাইলে তৎসহ ওযূ-গোসল অবশ্য অশুদ্ধ হইবে না। কিন্তু নখের নিচে অস্বাভাবিকরূপে ময়লা জমা হইলে তথায় পানি প্রবেশে বাধা জন্মায়। এইরূপ ময়লা দূর করা আবশ্যক। (অন্যথায় ওযূ-গোসল অশুদ্ধ হওয়ার আশংকা রহিয়াছে)।

www.BANGLAKITAB.com

হাম্মামে গোসলকারীর ওয়াজিবসমূহ ঃ হাম্মামে গোসলকারীর প্রতি চারটি কার্য ওয়াজিব এবং দশটি সুন্নত। ইহার মধ্যে দুইটি ওয়াজিব তাহার লজ্জাস্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট। ওয়াজিবসমূহ এই—(১) নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত অপরের দৃষ্টি হইতে বাঁচাইয়া রাখা। (২) হাম্মামের গোসল প্রদানকারীদের হাত যেন নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত কোন স্থানে না লাগে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা; কেননা দেখা অপেক্ষা এই স্থান স্পর্শ করা অধিকতর মন্দ। (৩) নিজে অপরের উক্ত স্থানের দিকে দৃষ্টি না করা। (৪) অপর কেহ হাম্মামের ভিতর সতর উন্মুক্ত করিলে ভয়ের কারণ না থাকিলে তাহাকে নিষেধ করা। ভয়ের কারণ গোসলখানা হইতে পাপী হইয়া বাহির হইতে হইবে। বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাম্মামে (গোসলখানায়) গেলে প্রাচীরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করত চক্ষুর উপর পর্দা বাঁধিয়া বসিতেন। এই ওয়াজিবগুলি স্ত্রীলোকদের পক্ষেও অবশ্য পালনীয়। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে হাম্মামে যাতায়াত তাহাদের জন্য শরীয়তে নিষিদ্ধ। সাধারণত তাহাদিগকে হাম্মামে যাইতে দিবে না।

হাম্মামের গোসলকারীর সুন্নতসমূহ ঃ (১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া নামায পড়িবার উদ্দেশ্যে গোসল করিবার নিয়ত করা; লোকের নিকট সুন্দর দেখাইবার উদ্দেশ্য থাকা উচিত নহে। (২) গোসলের পূর্বেই হাম্মামের ভৃত্যদিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক প্রদান করা; ইহাতে তাহারা কত পাইল জানিতে পারিয়া তোমাকে আনন্দের সহিত গোসল করাইবে। (৩) হাম্মামে প্রবেশকালে প্রথমে বাম পা ভিতরে দিবে এবং এই দু'আ পড়িবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرِجسِ النَّجَسِ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

অর্থাৎ "পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি। অপরিচ্ছন্নতাময় ও অপরিচ্ছন্নকারী বিতাড়িত শয়তান হইতে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি"; হাম্মাম শয়তানের স্থান, এই জন্যই এই দু'আ পড়িতে হয়। (৪) হাম্মাম নির্জনে পাইবার চেষ্টা করিবে অথবা এমন সময় হাম্মামে যাইবে যখন ইহা একেবারে খালি তাঁকে। (৫) হাম্মামের গরম প্রকোষ্ঠে অকস্মাৎ প্রবেশ করিবে না। করিলে অতিরিক্ত ঘাম বাহির হইবে। (৬) প্রবেশ করামাত্রই ওযূ করিবে। (৭) তৎপর তাড়াতাড়ি সমস্ত শরীর ধুইয়া ফেলিবে। এই পরিমাণ পানি ব্যবহার করিবে যাহাতে হাম্মামী দেখিয়া দুঃখিত না হয়। (৮) হাম্মামে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও সালাম করিবে না; তবে মুসাফাহা করা যাইতে পারে। কেহ সালাম করিয়া বসিলে উত্তরে বলিবে ঃ عَافَاكَ اللّٰهُ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন।" (৯) হাম্মামে অধিক কথাবার্তা বলিবে না। কুরআন শরীফ পড়িলে নীরবে পড়িবে। তবে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ উচ্চস্বরে পড়া দুরস্ত আছে। (১০) সূর্যাস্তের সময় এবং মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে হাম্মামে যাইবে না। কারণ, উহা শয়তানের চলাফেরার সময়।

গরম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে দোযখের আগুনের কথা স্মরণ করিবে। এবং তাড়াতাড়ি গোসল শেষ করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। অধিকক্ষণ তথায় থাকিবে না। দোযখের কয়েদখানায় কি বেশিক্ষণ থাকা যায়? যে কোন অবস্থা দেখিয়া পরকালের কথা স্মরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অন্ধকার দেখিলে কবরের অন্ধকার অবস্থা মনে করিবে। সাপ দেখিলে দোযখের সাপ স্মরণ করিবে। ভয়ঙ্কর কোন মূর্তি দেখিলে মুনকার-নাকীর ও দোযখের ফেরেশ্‌তার কথা ভাবিবে। বিকট শব্দ শুনিলে হযরত ইস্‌রাফীল (আ)-সিঙ্গার শব্দ স্মরণ করিবে। অপমানে পরকালের অপমান ও সম্মানে পরকালের সম্মানের কথা মনে করিবে। এই কাজগুলি শরীয়ত মতে সুন্নত। গোসল শেষে হাম্মাম হইতে বাহির হওয়ার সময় ঠাণ্ডা পানি দ্বারা পা ধুইবে। ইহা করিলে পায়ে নেক্‌রাস রোগ ও মাথা-বেদনার ভয় থাকে না। এ-সময় ঠাণ্ডা পানি মাথায় ঢালিবে না। গ্রীষ্মকালে গোসলের পর কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়া বিশেষ উপকারী।

অন্যান্য শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ঃ আরও কতকগুলি অতিরিক্ত পদার্থ হইতেও শারীরিক পরিচ্ছন্নতা লাভ করিতে হয়। উহা সাত প্রকার—(১) মাথার চুল মুড়াইয়া ফেলাই উত্তম এবং ইহা পবিত্রতার অধিকতর নিকটবর্তী। কিন্তু সৌখিন লোকদের পক্ষে চুল রাখাও দুরস্ত আছে। মাথার কতকাংশের চুল ফেলিয়া দেওয়া কিংবা সৈন্যদের ন্যায় বাবরী রাখা মকরূহ এবং উহা নিষিদ্ধ। (২) গোঁফ ওষ্ঠের সমান করিয়া কাটিয়া ফেলা সুন্নত, গোঁফ লম্বা করা নিষিদ্ধ। (৩) বগলের চুল প্রতি চল্লিশ দিনে একবার উপড়াইয়া ফেলা সুন্নত। ইহা না পারিলে মুড়াইয়া ফেলা উত্তম। কারণ, তাহাতে কোন কষ্ট হয় না। (৪) লজ্জাস্থানের চুল ক্ষুর দ্বারা বা অন্য কোন দ্রব্য ব্যবহারে পরিষ্কার করা সুন্নত। অন্তত চল্লিশ দিনে একবার পরিষ্কার করা আবশ্যক; ইহার অধিক বিলম্ব করা উচিত নহে। (৫) হাত-পায়ের নখ বৃদ্ধি পাইলে কাটিয়া ফেলা, যেন উহাতে ময়লা জমিতে না পারে। নখে ময়লা জমিলে ওযূ-গোসল অশুদ্ধ হয় না। কারণ, রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদল লোকের নখে ময়লা জমিতে দেখিয়া উহা কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন, কিন্তু নামায পুনরায় পড়িতে আদেশ দেন নাই। হাদীস শরীফে আসিয়াছে, নখ বৃদ্ধি পাইলে শয়তানের বসিবার স্থান হয়। যে আঙ্গুলের মর্যাদা বেশি সে আঙ্গুল হইতে নখ কাটা আরম্ভ করিবে। পায়ের চেয়ে হাত উত্তম এবং বাম অপেক্ষা ডান উত্তম। ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুল সমস্ত আঙ্গুলের মধ্যে উত্তম। অতএব এই আঙ্গুল হইতে নখ কাটা আরম্ভ করা উচিত। তৎপর ক্রমান্বয়ে ডান দিকের নখ কাটিয়া বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল হইতে আরম্ভ

www.BANGLAKITAB.com

করত সমস্ত নখ কর্তন করিয়া পুনরায় ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলের নিকট আসিয়া শেষ করিবে। নখ কাটিবার একটি সুন্দর প্রণালী এই উভয় হাতের তালু মুখা-মুখি করিয়া গোল আকারে ধর। তৎপর ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুল হইতে নখ কাটা আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে ডান দিকের নখ কাটিতে কাটিতে উভয় হস্তের নখ কর্তন করত পুনরায় ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলের নিকট আসিয়া শেষ করিবে (৬) নাভীর নাড়ী কর্তন করা; ইহা জন্মকালে কাটিতে হয়। (৭) খত্না করা।

দাড়ি ঃ দাড়ি লম্বা হইলে একমুষ্টি পরিমাণ রাখিয়া অতিরিক্ত অংশ কাটিয়া ফেলা দুরস্ত আছে। লম্বা দাঁড়ি রাখিতে যাইয়া যেন কেহ বাড়াবাড়ি না করে এইজন্যই এই বিধান করা হইয়াছে। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) ও তাবেঈনগণের একদল একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখিতেন। অপর দল বলেন, দাঁড়ি মোটেই ছাঁটা উচিত নহে।

দাড়ি সম্বন্ধে দশটি বিষয় মকরূহ—(১) পাকা দাড়িতে কালো খেযাব লাগান। কারণ, হাদীস শরীফে আছে যে, কালো খেযাব লাগান দোযখী ও কাফিরদের রীতি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ শেষ যমানায় কতিপয় লোক এমন হইবে যাহারা কালো খেযাব ব্যবহার করিবে, তাহারা বেহেশ্তের গন্ধও পাইবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে বৃদ্ধ নিজকে যুবকের ন্যায় সাজায় সে বৃদ্ধদের মধ্যে নিকৃষ্টতম। আর যে যুবক নিজেকে বৃদ্ধের মত সাজায় সে যুবকদের মধ্যে উত্তম। কালো খেযাব নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, ইহা মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়া থাকে; ইহা কৃত্রিম ও প্রবঞ্চনামূলক। (২) লাল জর্দা রঙের খেযাব লাগানও মাক্রূহ। কিন্তু ধর্ম-যোদ্ধাগণ কাফিরদের মনে ভীতি সঞ্চার বা নিজেদের বার্ধক্য গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করিলে উহা সুন্নত বলিয়া গণ্য হইবে। এই উদ্দেশ্যে কালো খেযাবও কোন কোন আলিম ব্যবহার করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য ব্যতীত সকল খেযাবই প্রবঞ্চনামূলক ও নাজায়েয। (৩) লোকের নিকট বৃদ্ধ বলিয়া পরিচয় প্রদান করত সম্মান লাভের আশায় গন্ধকের ধুম্র দ্বারা কালো দাড়ি সাদা করাও মাকরূহ। এই উপায়ে সম্মান লাভ করা যায় মনে করা নিতান্ত নির্বোধের কার্য। কারণ, ইল্ম ও বুদ্ধির কারণেই সম্মান লাভ হয়; বার্ধক্য বা যৌবনের কারণে সম্মান লাভ হয় না। হযরত আনাস (রা) বলেন, রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সময় তাঁহার মাত্র বিশটি চুল সাদা ছিল। (৪) বার্ধক্যকে লজ্জাজনক মনে করত সাদা দাড়ি তুলিয়া ফেলা মাক্রূহ। ইহাতে আল্লাহ্-প্রদত্ত নূরের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়। অজ্ঞতার কারণেই ইহা হইয়া থাকে। (৫) যৌবনের প্রারম্ভে বিলাস প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে এবং দাড়িবিহীন বালকের ন্যায় সুশ্রী দেখাইবার অভিপ্রায়ে দাড়ি উপড়াইয়া ফেলা ও দাড়ি মুড়ান মাক্রূহ। ইহাও অজ্ঞতার কারণেই হইয়া থাকে। কেননা কতিপয় ফেরেশতা এই তসবীহ পাঠ করেন ঃ

سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحٰى وَ النِّسَاءَ بِالذَّوَائِبِ ـ

অর্থাৎ "সেই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, যিনি পুরুষকে দাড়ি দ্বারা এবং স্ত্রীলোককে লম্বা কেশ দ্বারা সুশোভিত করিয়াছেন।" (৬) স্ত্রীলোকদের দৃষ্টিতে সুশ্রী দেখাইবার উদ্দেশ্যে এবং তাহাদিগকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দাড়িকে কবুতরের লেজের ন্যায় সুবিন্যস্ত করাও মাক্রূহ। (৭) মাথার কিয়দংশের চুল লম্বা করিয়া দাড়ির সহিত মিলাইয়া দেওয়া এবং পরহেযগারদের বিপরীত জোল্ফের চুল কানের লতির নিচে লম্বিত করিয়া দেওয়া মাক্রূহ। (৮) নিজের দাড়ির কৃষ্ণতা বা শুভ্রতা দেখিয়া গৌরববোধ করা মাক্রূহ। কারণ, যে ব্যক্তি নিজেকে গৌরবের চক্ষে দেখে আল্লাহ্ তাহাকে ভালবাসেন না। (৯) সুন্নত পালনের নিয়তে চিরুণী দ্বারা দাড়ি না আঁচড়াইয়া লোকচক্ষে সুন্দর দেখাইবার উদ্দেশ্যে চিরুণী ব্যবহার করা মাক্রূহ। (১০) লোকচক্ষে সংসারবিরাগী দরবেশরূপে গণ্য হওয়ার জন্য দাড়ি আলুথালু করিয়া রাখা মাক্রূহ। এইরূপ আকৃতি দেখিয়া লোকে মনে করিবে যে, এই দরবেশ চুলগুলি পর্যন্ত আঁচড়াইবার অবসর পান নাই।

পবিত্রতা সম্বন্ধে উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহাই যথেষ্ট।

www.BANGLAKITAB.com

চতুর্থ অধ্যায়

নামায

নামাযের ফযীলত ঃ নামায ইসলামের স্তম্ভ ও ধর্মের ভিত্তি। ইহা সকল ইবাদতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। যে ব্যক্তি আনুষঙ্গিক সকল শর্ত পালন-পূর্বক নামায আদায় করে, আল্লাহ্ তাহাকে স্বীয় আশ্রয় ও নিরাপত্তার মধ্যে রাখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। কবীরা গুনাহ হইতে বিরত থাকিয়া অসাবধানতা বশত সগীরা গুনাহ করিয়া ফেলিলে পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে উহা খণ্ডণ হইয়া যাইবে। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"পাঁচ ওয়াক্তের নামায কাহারও দ্বারদেশ দিয়া প্রবাহিত স্বচ্ছ সলিলা স্রোতস্বতী সদৃশ যাহাতে গৃহস্বামী প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করিয়া থাকে।" এতটুকু বলিয়া তিনি সাহাবাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে তাহার শরীরে কিছু ময়লা থাকিতে পারে কি?" তাঁহারা উত্তর দিলেন—"না।" তৎপর তিনি বলিলেন—"পানি যেরূপ ময়লা দূর করে এই পাঁচ ওয়াক্তের নামায তদ্রূপ গুনাহ বিদূরিত করে।" রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"নামায ধর্মের স্তম্ভ। যে ব্যক্তি ইহা বর্জন করিয়াছে সে ধর্মকে বিনাশ করিয়াছে।" সাহাবা (রা)-গণ নিবেদন করিলেন॥"ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সর্বোত্তম কাজ কোন্‌টি?" তিনি বলিলেন—"ঠিক সময়ে নামায পড়া।" তিনি আরও বলেন—"নামায বেহেশতের কুঞ্জী।" তিনি অন্যত্র বলেন, "তওহীদের পর নামায অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন জিনিস আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাগণের উপর ফরয করেন নাই।" অপর কোন ইবাদত নামায অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইলে ফেরেশতাগণকে তিনি তাহাতেই নিযুক্ত রাখিতেন। অথচ ফেরেশতাগণ সর্বদা নামাযেই রত রহিয়াছেন। কতক ফেরেশতা সিজদায়, কতক ফেরেশতা নামাযে দণ্ডায়মান, কতক ফেরেশতা নামাযে উপবিষ্ট আছেন। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায বর্জন করিল সে কুফরী কাজ করিল।" অর্থাৎ সে এমন কাজের নিকটবর্তী হইল যাহাতে তাহার আসল ঈমানই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। যেমন লোকে বলিয়া থাকে—মরুপ্রান্তরে কাহারও পানি নিঃশেষ হইয়া গেলে সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহার অর্থ এই যে, এরূপ স্থানে পানি নিঃশেষ হইয়া গেলে ধ্বংসপ্রাপ্তির আশঙ্কা থাকে। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"কিয়ামত দিবস সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব লওয়া হইবে। যাবতীয় শর্তসহ যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকিলে আল্লাহ্ উহা কবূল করিবেন। অন্যান্য ইবাদত উহার অধীন থাকিবে। এইগুলি যেমনই হউক (নামাযের সহিত) কবূল হইয়া যাইবে। কিন্তু নামাযই অপূর্ণ হইলে অন্যান্য ইবাদত সহ উহা নামাযীর মুখের উপর নিক্ষেপ করা হইবে।" রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে পবিত্রতা অবলম্বনপূর্বক নামায আদায় করে, রুকূ-সিজদা পুরাপুরি সম্পন্ন করে এবং হৃদয়ে যথেষ্ট নম্রতা ও দীনতাকে স্থান দেয়, তাহার নামায উজ্জ্বল হইয়া আরশ পর্যন্ত পৌঁছে এবং নামাযীদের লক্ষ্য করিয়া বলে, যেরূপ যত্নের সহিত তুমি আমাকে সম্পন্ন করিয়াছ, আল্লাহ্ তদ্রূপ যত্নে তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করুন। আর যে ব্যক্তি ঠিক সময়ে নামায পড়ে না, যথারীতি ওযূ করে না এবং রুকূ-সিজদায় পূর্ণ নম্রতা অবলম্বন করে না, তাহার নামায কৃষ্ণবর্ণ ধারণ-পূর্বক আসমান পর্যন্ত উত্থিত হয় এবং নামাযীকে সম্বোধন করিয়া বলে, তুমি যেমন আমাকে নষ্ট করিলে আল্লাহ্ তদ্রূপ তোমাকে বিনষ্ট করুন। যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ততক্ষণ নামায এইরূপ অভিসম্পাত দিতে থাকে। তৎপর পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রের ন্যায় পুটুলি বাঁধিয়া উক্ত নামাযকে সেই নামাযীর মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়।" রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"যে ব্যক্তি নামাযে চুরি করে (অর্থাৎ যথারীতি নামায আদায় করে না) সে-ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চোর।"

নামাযের জাহেরী আমল ঃ নামাযের জাহেরী আমলসমূহ ইহার দেহ-স্বরূপ। ইহা ছাড়া নামাযের একটি বাতেনী অবস্থা আছে; উহাকে নামাযের রূহ বলা হয়। এখন নামাযের জাহেরী আমলগুলি বর্ণিত হইবে।

প্রথমে পাক শরীরে পাক কাপড় পড়িবে এবং সতর ঢাকিবে। তৎপর পাক জায়গায় কিব্‌লামুখী হইয়া দাঁড়াইবে। দণ্ডায়মান অবস্থায় দুই পায়ের মধ্যে চারি আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখিবে। পিঠ ঠিক সোজা করিয়া রাখিবে, মাথা সম্মুখ-দিকে কিঞ্চিত ঝুঁকাইয়া দিবে। সিজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে। সোজা দাঁড়াইয়া শয়তানকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে সমস্ত 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' সূরা পাঠ করিবে। অপর কেহ নামাযে শামিল হইবার সম্ভাবনা থাকিলে নামায আরম্ভ করিবার পূর্বেই উচ্চ স্বরে আযান দিবে। অন্যথায় কেবল ইকামত বলিলেই চলিবে। তৎপর মনে মনে নামাযের নিয়ত করিবে; যেমন জোহরের ফরয পড়িবার সময় মনে মনে বলিবে—আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে জোহরের ফরয নামায আদায় করিতেছি। নিয়তের মর্ম হৃদয়ঙ্গম হইলে উভয় হাত এমনভাবে উঠাইবে যাহাতে বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ কানের লতি পর্যন্ত এবং হাতের কব্জা স্কন্ধ পর্যন্ত উত্থিত হয়। তৎপর 'আল্লাহু আকবর' উচ্চারণপূর্বক দুই হাত বক্ষস্থলের নিচে (হানাফী মযহাব মতে নাভীর নিচে) বাঁধিবে।

www.BANGLAKITAB.com

ডান হাত উপরে রাখিবে। ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী বাম হাতের উপর সোজাভাবে স্থাপন করিবে। আর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি এক পার্শ্বে এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকা অপর পার্শ্বে স্থাপনপূর্বক বাম হাতের কব্জা বেড়িয়া ধরিবে (হানাফী মযহাব মতে ডান হাতের মাঝের তিন অঙ্গুলি বাম হাতের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করত বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠার সাহায্যে বাম হাতের কব্জা আঁকড়াইয়া ধরিতে হয়।) কানের লতির নিকট হইতে হাত নামাইবার সময় উহা নিচে ছাড়িয়া দিবে না; বরং হাত নামাইবার সময়ই বক্ষস্থলে স্থাপন করিবে। ইহাই অধিকতর সহীহ নিয়ম। এই সময় হাত ঝাড়া দিবে না বা এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করিবে না। তকবীর বলার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বাক্যের শেষ অক্ষর ر এর পেশকে টানিয়া পড়িবে না যাহাতে و এর উৎপত্তি হয় কিংবা اَكْبَرُ শব্দের ب অক্ষরটিকে টানিয়া এতটুকু লম্বা করিবে না যাহাতে ب এর উপরস্থ যবরটি দীর্ঘ হইয়া الف এ পরিণত হইয়া পড়ে। সন্দেহ বায়ুগ্রস্ত ও নির্বোধ লোকেরাই এইরূপ করিয়া তাকে। কথাবার্তার সময় লোকে যেমন স্বাচ্ছন্দে কথা বলে এবং কোন অক্ষরকে অযথা লম্বা করে না, নামাযেও তদ্রূপ উচ্চারণ করা উচিত। হাত বাঁধার সময় বলিবে—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা বার বার একমাত্র আল্লাহ্রই জন্য। ভোরে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি।"

এই সময় পড়িবে—

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদ হইতে বিমুখ হইয়া আল্লাহ্র দিকে রুজু হইলাম যিনি আস্মানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন! আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।" তৎপর পড়িবে—

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

(হানাফী মযহাব মতে انى وجهت الخ তাহরীমা বাঁধার পূর্বে পড়া মুস্তাহাব। তাহ্রীমার পর ক্রমান্বয়ে اعوذ بالله এবং سبحانك بسم الله পড়িতে হয়)।

তৎপর সূরা ফাতিহা পড়িবে। যুক্ত হরফগুলি খুব পরিষ্কার করিয়া পড়িবে। হরফ উচ্চারণের সময় এত বাড়াবাড়ি করিবে না যাহাতে শীঘ্র পরিশ্রান্ত হইয়া পড়। ض ও ظ এর উচ্চারণে পার্থক্য করিবে। চেষ্টা করিয়া অগত্যা অক্ষম হইলেও নামায দুরস্ত হইবে। সূরা ফাতিহা শেষ করত সামান্য পরিমাণ থামিয়া 'আমীন' বলিবে। সূরা ফাতিহার শেষে একেবারে মিলাইয়া বলিবে না। তৎপর কুরআন শরীফের যে সূরা ইচ্ছা হয় পড়িবে। মুক্তাদী না হইলে ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযের প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত উচ্চস্বরে পড়িবে। তৎপর রুকূর তক্বীর এইরূপে বলিবে যেন সূরার শেষ শব্দের সহিত ইহা মিলিয়া না যায়। এই তক্বীর বলিবার সময় তক্বীরে তাহ্রীমার ন্যায় উভয় হস্ত কান পর্যন্ত উঠাইবে। (হানাফী-মযহাব মতে এস্থলে হাত উঠাইতে হইবে না।) ইহার পর রুকূ করিবে। রুকূতে গিয়া দুই হাতে তালু দুই জানুর উপর স্থাপন করত আঙ্গুল খোলাভাবে সোজা পশ্চিম দিকে রাখিবে। (হানাফী মতে তালু হাঁটুর উপর স্থাপনপূর্বক আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিকভাবে ফাঁক রাখিয়া দুই হাঁটু শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিতে হয়।) উভয় হাঁটু সোজা রাখিবে, এক হাঁটু অপর হাঁটুর সহিত মিলাইবে না। মাথা ও পিঠ বরাবর সমান উঁচু রাখিবে। বাহুদ্বয় পাঁজরের সহিত না চাপাইয়া দূরে রাখিবে। কিন্তু স্ত্রীলোক বাহু পাঁজরের সহিত চাপাইয়া রাখিবে। রুকূতে থাকিয়া তিন বার বলিবে— سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ "আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা এবং প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি।" ইমাম না হইলে এই তসবীহ সাত হইতে দশবার বলা উত্তম। তৎপর রুকূ হইতে উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে এবং দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাইবে (হানাফী মতে এস্থলেও হাত উঠাইতে হইবে না) ও বলিবে— سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ অর্থাৎ "আল্লাহ্ প্রশংসাকারীদের প্রশংসা শ্রবণ করেন।" তৎপর দণ্ডায়মান অবস্থায় বলিবে—

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَاَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمِلَاَمَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ ـ

অর্থাৎ "হে প্রভো, তোমার জন্য সমস্ত আসমান ও যমীন পরিপূর্ণ প্রশংসা এবং এতদ্ব্যতীত যত বস্তু তোমার ইচ্ছা সে সমস্ত পরিপূর্ণ তোমার প্রশংসা।" ফজরের ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে দো'আ কুনূত পড়িবে। (হানাফী মতে পড়িতে হয় না।) ইহার পর তকবীর বলিয়া সিজদায় যাইবে এবং শরীরের যে অঙ্গ যমীনের নিকটবর্তী সেই অঙ্গ প্রথমে যমীনের উপর স্থাপন করিবে; অর্থাৎ প্রথমে হাঁটু, তৎপর ক্রমান্বয়ে হাত, কপাল ও নাক যমীনের উপর রাখিবে। দুই হাত যমীনের উপর স্কন্ধের বরাবর রাখিবে। হাতের অঙ্গুলিগুলি খোলা রাখিবে এবং কব্জী মাটির সহিত মিলাইবে না। বাহু, পাঁজর, উরু ও পেট পরস্পর ফাঁক রাখিবে। কিন্তু স্ত্রীলোক এই সকল অঙ্গ পরস্পর মিলাইয়া রাখিবে। তৎপর তিনবার বলিবে—

www.BANGLAKITAB.com

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى وَ بِحَمْدِهٖ -

ইমাম না হইলে ততধিক বার বলাই উত্তম। তাহার পর 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া সিজদা হইতে উঠিবে এবং বাম পায়ের উপর বসিবে, দুই হাত জানুর উপর রাখিয়া বলিবে—

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَ ارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاعْفُ عَنِّيْ وَعَافِنِيْ -

অর্থাৎ "হে প্রভো, আমার গুনাহ্ মাফ কর, আমার উপর দয়া কর, আমাকে জীবিকা দান কর, আমাকে সৎপথ দেখাও, আমাকে আশ্রয় দাও, আমার অপরাধ ক্ষমা কর এবং আমাকে শান্তিতে রাখ।" অতঃপর পূর্ববৎ দ্বিতীয় সিজদা করত বসিয়া তকবীর বলিয়া দাঁড়াইবে। (হানাফী মযহাব মতে দ্বিতীয় সিজদা করিয়া না বসিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিতে হইব।)

অনন্তর প্রথম রাকআতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকআত পড়িবে। সূরা ফাতিহার পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ্' পড়িবে। (হানাফী মযহাব মতে কেবল প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ্' পড়িতে হয়। অন্যান্য রাকআতে কেবল 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়িতে হয়।) দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদার পর বাম পা বিছাইয়া তদুপরি বসিয়া 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়িবে। এই সময় দুই হাত দুই জানুর উপর রাখিবে। কিন্তু ডান হাতের অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ রাখিবে, কেবল তর্জনী অঙ্গুলি সোজাভাবে খোলা রাখিবে (হানাফী মযহাব মতে অঙ্গুলি প্রথমেই মুষ্টিবদ্ধ না করিয়া 'আশহাদু' বলিবার কালে মুষ্টিবদ্ধ করিতে হয় এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলিবার সময় তর্জনী খাড়া করিয়া এক আল্লাহ্‌র দিকে ইশারা করত ইহা সোজাভাবে ছাড়িয়া দিতে হয়)। কলেমা শাহাদাত পড়িবার সময় যখন 'ইল্লাল্লাহ' বলিবে তখন তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিবে। 'লা-ইলাহা' বলিবার সময় ইশারা করিবে না। বৃদ্ধাঙ্গুলি খোলা রাখা দুরস্ত আছে। শেষ বৈঠকেও এইরূপ করিবে। কিন্তু উভয় পা নিচ হইতে ডান পার্শ্বে বাহির করিয়া দিবে এবং বাম নিতম্বের উপর বসিবে। (হানাফী মতে উভয় বৈঠকেই স্ত্রীলোকের জন্য এইরূপ বসিবার বিধান। পুরুষের জন্য উভয় বৈঠকের ন্যায় ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখিয়া বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া উহার উপর বসিতে হয়।) প্রথম বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়িয়া দরূদ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ পর্যন্ত দাঁড়াইবে। (হানাফী মতে প্রথম বৈঠকে দরূদ পড়িতে হয় না।) কিন্তু শেষ বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতু'র পর পূর্ণ দরূদ শরীফ ও মশ্‌হুর দু'আয়ে মাছূরা পড়িবে। তৎপর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলিবে এবং ডান দিকে মুখ এমনভাবে ফিরাইবে যেন এই পার্শ্বস্থ পশ্চাতের

লোক মুখমণ্ডলের অর্ধাংশ দেখিতে পায়। অতঃপর এইরূপে বাম দিকেও সালাম ফিরাইবে। সালামের সময় নামায হইতে অবসর লাভের এবং মুসল্লী ও ফেরেশ্‌তাগণকে সালাম করিতেছ বলিয়া নিয়ত করিবে।

নামাযের মাক্‌রূহসমূহ ঃ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ সংবরণ, কর্মব্যস্ততা ইত্যাদি যে সমস্ত কাজ মনের একাগ্রতা নষ্ট করে এবং হৃদয়ের ভয় ও বিনয় বিনাশ করে তদ্রূপ অবস্থায় নামায পড়া মাক্‌রূহ। দুই পা পরস্পর মিলাইয়া দণ্ডায়মান হওয়া, এক পা উঁচু করা, সিজদার সময় পায়ের অগ্রভাগে বসা, দুই নিতম্বের উপর বসা, দুই জানু বুক পর্যন্ত আনয়ন করা, হাত কাপড়ের নিচে ও আস্তিনের ভিতরে রাখা, সিজদার সময় অগ্র-পশ্চাৎ দিক হইতে কাপড় টানিয়া এদিক-ওদিক করিয়া লওয়া, কাপড়ের উপর কোমরবন্ধ বাঁধা, হাত ছাড়িয়া দেওয়া ও এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করা, আঙ্গুল মটকান, শরীর চুলকান, হাই তোলা, দাঁড়ি লইয়া খেলা করা, সিজদার স্থান হইতে কঙ্কর সরান, সিজদার স্থানে ফুঁক দেওয়া, আঙ্গুলসমূহ পরস্পর মিলাইয়া রাখা এবং পিঠ বাঁকা করা মাক্‌রূহ। মোটকথা, চক্ষু, হস্ত এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় বিনয় ও আদবের সহিত রাখিতে হইবে যেন নামায পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় হইয়া আখিরাতের সম্বলস্বরূপ হইতে পারে।

উপরে নামাযের যে সমস্ত আরকান বর্ণিত হইল তন্মধ্যে চৌদ্দটি ফরয—(১) নিয়ত করা, (২) তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলা, (৩) দাঁড়াইয়া নামায পড়া, (৪) সূরা ফাতিহা পড়া, (৫) রুকূ করা, (৬) রুকূ অবস্থায় কিছুক্ষণ বিলম্ব করা, (৭) রুকূ হইতে উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান, (৮) দণ্ডায়মান অবস্থায় কিছুক্ষণ বিলম্ব করা, (৯) সিজদা করা, (১০) সিজদা অবস্থায় কিছুক্ষণ বিলম্ব করা, (১১) দুই সিজদার মধ্যস্থলে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসা, (১২) শেষ বৈঠক, (১৩) দরূদ শরীফ পড়া এবং (১৪) সালাম ফিরান। (হানাফী মযহাব মতে নামাযের মধ্যে ৭টি ফরয, ১৯টি ওয়াজিব এবং ২৬টি সুন্নত কাজ আছে।)

উপরে বর্ণিত কাজগুলি যথারীতি সম্পন্ন করিলে নামায শুদ্ধ হইয়া যাইবে; অর্থাৎ নামাযীর উপর দুনিয়াতে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করা যাইবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র দরবারে নামায কবূল হইবে কিনা, এ সম্বন্ধে সংশয় থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ—মনে কর, এক ব্যক্তি বাদশাহের দরবারে নযর দিবার জন্য একটি দাসী লইয়া গেল। দাসীটির প্রাণ আছে বটে; কিন্তু তাহার নাক, কান, হাত-পা নাই। এরূপ অঙ্গহীনা দাসী বাদশাহের দরবারে গৃহীত হওয়া সম্বন্ধে প্রবল সন্দেহ থাকে। (কেবল ফরয আদায় করত নামায পড়ার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ)।

নামাযের রূহ ও হাকীকত ঃ উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা নামাযের দেহ স্বরূপ। এই দেহের এক হাকীকত (মূলতত্ত্ব) রহিয়াছে; ইহাই নামাযের রূহ্ (প্রাণ)।

www.BANGLAKITAB.com

মোটকথা, প্রত্যেক নামায ও প্রত্যেক ইবাদতেরই রূহ আছে। নামাযের আসল রূহ্ না থাকিলে ইহা মৃত মানুষের প্রাণহীন দেহস্বরূপ। আসল রূহ্ থাকিলেও নামাযের আনুষঙ্গিক কার্যসমূহ যথারীতি সম্পন্ন না হইলে উহা চক্ষু উৎপাটিত এবং ছিন্নকর্ণ মানুষের ন্যায় অঙ্গহীন হইবে। আবার নামাযের আনুষঙ্গিক কার্যগুলি যথারীতি সম্পন্ন করিলেও ইহা প্রাণহীন হইলে এইরূপ হইবে যেমন—এক ব্যক্তির চক্ষু আছে কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নাই; কান আছে; কিন্তু শ্রবণশক্তি নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নামাযে বিনয় ও একাগ্রচিত্ততা রক্ষা করাই নামাযের প্রাণ। কারণ, আল্লাহ্র সহিত অকপটভাবে অন্তর নিবিষ্ট রাখা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও ভয়-ভীতির হৃদয়ঙ্গম করত মনে তাঁহার স্মরণকে সজীব করিয়া তোলাই নামাযের আসল উদ্দেশ্য। এই মর্মেই আল্লাহ্ বলেন ঃ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ অর্থাৎ "আমার স্মরণের জন্য নামায পড়" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"এমন অনেক নামাযী আছে যাহারা পরিশ্রম ও ক্লান্তি ব্যতীত নামায হইতে আর কিছুই পায় না। ইহার কারণ এই যে, তাহারা নিজেদের শরীর নামাযে রত রাখে বটে; কিন্তু তাহাদের মন একেবারে উদাসীন থাকে। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "এমন বহু নামাযী আছে যাহাদের নামাযের এক ষষ্ঠাংশ বা এক দশমাংশ লিখিত হয়।" অর্থাৎ নামাযের যে অংশে আল্লাহ্র দিকে মন নিবিষ্ট থাকে কেবল সেই অংশই লেখা হইয়া থাকে। তিনি আরও বলেন—"কোন বন্ধুকে যেমন বিদায় দিতেছ, এইভাবে নামায পড়িবে। অর্থাৎ নামাযে স্বীয় অস্তিত্ব ও সমস্ত বাসনা-কামনা এমনকি আল্লাহ্ ব্যতীত সকল বস্তুর চিন্তা অন্তর হইতে একেবারে বিদূরিত করত একমাত্র আল্লাহ্র ধ্যানে নিজেকে নিমগ্ন রাখিবে। এই জন্যই হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—"আমি এবং রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পরস্পর কথাবার্তা বলিবার সময় নামাযের সময় হইলে তিনি আমাকে চিনিতেন না এবং আমিও তাঁহাকে চিনিতাম না। অর্থাৎ নামাযের সময় হওয়া মাত্রই আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও ভয় তাঁহাদের শরীরের ভিতর বাহিরকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—যে নামাযে নামাযীর মন আল্লাহ্র দিকে আকৃষ্ট হয় না, সেই নামাযের প্রতি আল্লাহ্ দৃষ্টিপাত করেন না। নামায পড়িবার সময় হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের হৃদয়ের বুদবুদ শব্দ দুই মাইল দূর হইতে শোনা যাইত। নামায পড়িবার সময় রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অন্তর হইতে এমন টগবগ শব্দ উত্থিত হইত যেন কোন পানিপূর্ণ তাম্রপাত্র আগুনের উপর উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতেছে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নামাযের জন্য প্রস্তুত হইতেন তখন তাঁহার দেহে কাঁপন উপস্থিত হইত, তাঁহার শরীরের বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইত এবং তিনি বলিতেন এমন এক আমানতের বোঝা বহনের সময় আসিয়াছে যাহা সাত যমীন ও সাত আসমান বহন করিতে সক্ষম হয় নাই।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রা) বলেন—নামাযের মধ্যে যাহার মনে বিনয়-দীনতা না আসে, তাহার নামায সহীহ হয় না। হযরত হাসান বসরী (রা) বলেন—একাগ্রচিত্ততার সহিত যে নামায আদায় করা হয় না তাহা আযাবের নিকটবর্তী। হযরত ইবনে জাবাল (রা) বলেন, যে ব্যক্তি নামাযে থাকিয়া স্বেচ্ছায় তাহার ডান-বামের লোককে চিনিবার চেষ্টা করে তাহার নামায হইবে না। হযরত ইমাম আবূ হানিফা (রা), হযরত ইমাম শাফেঈ (রা) ও অধিকাংশ আলিম যদিও বলিয়াছেন যে, তক্বীরে তাহরীমা বলিবার সময় মন আল্লাহ্র দরবারে হাযির থাকিলে এবং অন্যান্য চিন্তা হইতে মন মুক্ত রাখিয়া নামায আরম্ভ করিতে পারিলেই নামায হইয়া যাইবে; কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক বোধে তাহারা এই ফতওয়া দিয়াছেন। কারণ সর্বসাধারণ লোক আজকাল নিতান্ত গাফিল হইয়া পড়িয়াছে। আর নামায হইয়া যাইবে বলিয়া তাঁহারা যে ফত্ওয়া দিয়াছেন তাহার অর্থও ইহাই যে, সেইরূপ নামাযী দুনিয়াতে শরীয়তের বিচার হইতে অব্যাহতি পাইবে। কিন্তু যে নামাযে নামাযীর মন আল্লাহ্র দরবারে অনবরত হাযির থাকে কেবল তাহাই আখিরাতের সম্বল হইতে পারে। মোটকথা, তকবীরে তাহরীমার সময় আল্লাহ্র দরবারে মন হাযির রাখিতে পারিলে কিয়ামতের দিন এমন নামাযীর অবস্থা একেবারে বেনামাযী অপেক্ষা ভাল হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অবস্থা বেনামাযী অপেক্ষা অধিক মন্দ হওয়ার আশঙ্কাও আছে। কারণ যে ভৃত্য প্রভুর সেবায় উপস্থিত হইয়া অবহেলা ও বেয়াদবী করে, প্রভু নিশ্চয়ই অনুপস্থিত ভৃত্য অপেক্ষা এইরূপ বেয়াদব ভৃত্যের প্রতি অধিক রাগান্বিত হইবেন এবং তাহাকে অনুপস্থিত ভৃত্য অপেক্ষা কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। এইজন্যই হযরত হাসান বসরী (রা) বলিয়াছেন—একাগ্রচিত্ততার সহিত যে নামায আদায় করা হয় না তাহা আযাবের নিকটবর্তী এবং সওয়াব হইতে দূরবর্তী।' হাদীস শরীফে উক্ত আছে—"যে নামাযী নিজ নামাযকে বাজে কল্পনা ও অযথা চিন্তা হইতে রক্ষা করে না, সে আল্লাহ্র দরবার হইতে দূরবর্তী হওয়া ব্যতীত উক্ত নামাযে কোন ফল পাইবে না।"

উপরে যে সমস্ত আয়াত, হাদীস ও বুযর্গগণের বাণী উদ্ধৃত হইল উহা হইতে অবগত হইয়াছ যে, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে নামাযে নামাযীর মন আল্লাহ্র দরবারে হাযির থাকে কেবল সেই নামাযই পূর্ণ ও সজীব। আর যে নামাযে শুধু তকবীরে তাহরীমার সময় মন হাযির থাকে ইহার জীবন মাত্র মুহূর্তকাল স্থায়ী হয়। এইরূপ নামায আসন্ন মৃত্যুরোগী সদৃশ।

নামাযের আরকানসমূহের রূহ ও হাকীকত

আযান ঃ নামাযের সময় হইলে নামায সম্বন্ধে যে ধ্বনি কর্ণগোচর হয় তাহাকে আযান বলে। ইহাই নামাযের গুপ্ত রহস্যের উৎস। আযানের শব্দগুলি অতি আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবে। কোনও কাজে লিপ্ত থাকিলে আযানের আওয়াজ

www.BANGLAKITAB.com

শোনামাত্র তাহা ত্যাগ করিবে। দুনিয়ার সকল বিষয় হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে। পূর্বকালের লোকেরা এইরূপই করিতেন, অর্থাৎ দুনিয়ার সকল কাজ ছাড়িয়া আযান শ্রবণ করাকে তাঁহারা কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তৎকালের কর্মকার লোহা পিটাইবার জন্য হাতুড়ি উঠাইয়াছে, এমন সময় আযানের শব্দ কানে আসিলে তৎক্ষণাৎ হাতুড়ি ঐ অবস্থায়ই পরিত্যাগ করিত, আর লোহার উপর মারিত না। চর্মকার চামড়ার ভিতর সুতা প্রবেশ করাইয়াছে, এমন সময় আযান শুনিলে সেই অবস্থায়ই পরিত্যাগ করিত, সূঁচ বাহির করার অপেক্ষাও করিত না। আযানের শব্দে কিয়ামতের ধ্বনি তাহাদের স্মরণ হইতে এবং মনে করিত, যে ব্যক্তি আযানের শব্দে সন্তুষ্টচিত্তে আজ্ঞা পালনের জন্য দৌড়াইয়া যাইবে, সে কিয়ামতের সিঙ্গাধ্বনির সুসংবাদে সন্তুষ্ট হইবে। পূর্বকালের লোকদের ন্যায় আযান শ্রবণে আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিলে কিয়ামতের সিঙ্গা-ধ্বনিতে তুমিও সন্তুষ্ট হইতে পারিবে।

পবিত্রতা ঃ শরীর ও পরিধেয় বস্ত্রের পবিত্রতাকে বাহিরাবয়বের পবিত্রতা মনে কর এবং জানিয়া রাখ যে, অনুতাপের সহিত সমস্ত মন্দ স্বভাব হইতে হৃদয়কে পবিত্র করাই বাহ্য পবিত্রতার প্রাণ। কারণ আল্লাহ্‌র লক্ষ্যস্থল হৃদয়। নামাযের বহিরাকৃতির স্থান দেহ, আর নামাযের হাকীকতের স্থান হইল হৃদয়।

সতর ঢাকা ঃ শরীরের গুপ্ত অঙ্গসমূহ লোকচক্ষু হইতে ঢাকিয়া রাখাই সতর ঢাকার তাৎপর্য। ইহার রহস্য ও প্রাণ হইল যাহা তোমাদের অন্তরে মন্দ তাহা আল্লাহ্‌র দৃষ্টি হইতে গোপন রাখা। আর ইহাও জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টি হইতে কিছুই গোপন রাখা যায় না। অন্তরকে সকল দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র করাই ইহার প্রকৃত অর্থ। অন্তরকে পবিত্র করার উপায় এই—পূর্বকৃত গোনাহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবে এবং দৃঢ়সংকল্প হইবে যে, পুনরায় আর কখনও গোনাহ্ করিবে না।

হাদীসে আছে ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَّ ذَنْبَ لَهُ۔

অর্থাৎ "পাপ হইতে তওবাকারী একেবারে নিষ্পাপ হইয়া যায়।" অর্থাৎ পাপানুষ্ঠানের পর তওবা করিলে পাপ সমূলে বিনষ্ট হয়। আর একান্তই যদি অনুতাপের সহিত পাপ বর্জন না করা যায় তবে পাপকে ভয় ও লজ্জার আবরণে ঢাকিয়া ভীত ও বিমর্ষ হৃদয়ে এমনভাবে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে যেন কোন ভৃত্য অপরাধ করত পলাইয়া গিয়া আবার প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং লজ্জা ও অপমানের কারণে মস্তক উত্তোলন করে না।

কিবলামুখী হওয়া ঃ ইহার প্রকাশ্য অর্থ হইল অপর সমস্ত দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কেবল কা'বা শরীফের দিকে মুখ করা। কিন্তু ইহার তাৎপর্য হইল উভয়

জগত হইতে মনের সংযোগ ছিন্ন করত কেবল আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগ স্থাপন করা যাহাতে বাহির ও ভিতরের মধ্যে ঐক্য সাধিত হয়। কা'বা শরীফে যেমন বাহিরের একমাত্র কিবলা তদ্রূপ আল্লাহ্‌ও অন্তরের একমাত্র কিবলা। নামাযের মধ্যে অন্তরকে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর চিন্তায় লিপ্ত করা নামাযে থাকিয়া মুখ এদিক-ওদিক ফিরানতুল্য। মুখ এদিক-ওদিক ফিরাইলে যেমন নামাযের বাহ্য আকৃতি নষ্ট হয় তদ্রূপ মন এদিক-ওদিক বিচরণ করিলেও নামাযের প্রাণ ও মূল স্বরূপ বিনষ্ট হয়। এই জন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"যে ব্যক্তি নামাযে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় মুখ, অন্তর ও প্রবৃত্তি এই তিনটিকে একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে আকৃষ্ট রাখে সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নামায হইতে বাহির হইয়া আসে।" অর্থাৎ তাহার সমস্ত পাপ-খণ্ডন হইয়া যায় এবং সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হইয়া পড়ে। দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর, নামাযের মধ্যে মুখ কিবলা হইতে অন্য দিকে ফিরাইলে নামাযের বাহ্য আকৃতি যেমন নষ্ট হয়, আল্লাহ্‌র দিক হইতে মনের ধ্যান অন্যমুখী করত সাংসারিক চিন্তা মনে স্থান দিলে নামাযের প্রাণ ও সারবস্তু তদ্রূপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মনকে আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্ট রাখা অতি উত্তম। কারণ বাহির ভিতরের আবরণস্বরূপ। আবরণের ভিতর যাহা ঢাকিয়া রাখা হয় তাহাই মূল উদ্দেশ্য; এতদ্ব্যতীত আবরণের নিজস্ব মূল্য নিতান্ত অল্প।

নামাযে দণ্ডায়মান হওয়া ঃ ইহার প্রকাশ্য অর্থ, অবনত মস্তকে আজ্ঞাবহ গোলামের ন্যায় আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া। ইহার তাৎপর্য হইল যাবতীয় চিন্তা ও কল্পনা হইতে মনকে নিবৃত্ত করত বিনয় ও দীনতা এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র প্রতি একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত নিজকে তাঁহার আদেশ পালনার্থে প্রবৃত্ত রাখা। তদসঙ্গে আরও মনে রাখিতে হইবে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সমীপে হাযির ও দণ্ডায়মান হইতে হইবে এবং সেই দিন তোমার সমস্ত গুপ্ত বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আরও ভাবিবে যে, এখনও আল্লাহ্‌র নিকট তোমার সমস্ত বিষয় সুস্পষ্টরূপে বিদিত আছে এবং তোমার অন্তরে যাহা কিছু ছিল ও আছে সবই তিনি জানেন ও দেখেন; আর তোমার ভিতর-বাহিরের সব কিছুই তিনি ভালরূপে অবগত আছেন। যদি কোন নেককার লোক তুমি কিরূপে নামায পড় তাহা লক্ষ্য করেন তবে তুমি তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযত করিয়া লও, এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত কর না, নামাযে তাড়াতাড়ি করা ও এদিক-সেদিকে দৃষ্টি করাকে লজ্জাজনক মনে কর। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আল্লাহ্‌র চক্ষের সম্মুখে তুমি নামাযে দণ্ডায়মান রহিয়াছ, অথচ তাঁহাকে লজ্জা ও ভয় কর না। দুর্বল মানুষ যাহার কোন ক্ষমতাই নাই তাহার সম্মুখে তুমি লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়, তাহাকে দেখিয়া তুমি বিনীত হও; কিন্তু সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, বিশ্বপতি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিকে তুমি মোটেই ভয় কর না, তাঁহার দৃষ্টিকে মানবের

www.BANGLAKITAB.com

দৃষ্টি অপেক্ষা সহজ মনে কর, ইহার চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে? হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরয করিলেন—"ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্‌র নিকট কিরূপ লজ্জিত হওয়া উচিত?" তিনি বলিলেন, "নিজ পরিবারের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম ও পরহেযগার তাঁহাকে তুমি যেমন লজ্জা কর আল্লাহ্‌কেও তদ্রূপ লজ্জা কর।" এইরূপ সম্মান প্রদর্শনের কারণেই অধিকাংশ সাহাবা (রা) নামাযে এমন স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন যে, তাঁহাদিগকে প্রস্তর মনে করিয়া পাখি তাঁহাদের মস্তকের উপর বসিত এবং উড়িয়া যাইত না। যাঁহার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব বদ্ধমূল হইয়াছে এবং আল্লাহ্ তাঁহাকে দেখিতেছেন বলিয়া যিনি বিশ্বাস করেন, তাঁহার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনয় ও আদবে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। এইজন্যই রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামাযের মধ্যে লোককে দাড়ি নাড়াচাড়া করিতে দেখিয়া বলিতেন—"তাহার অন্তরে বিনয় থাকিলে তাহার হাতও অন্তরের সেই গুণে গুণান্বিত হইত।"

রুকূ-সিজদা ঃ শরীরের অঙ্গপ্র-ত্যঙ্গ দ্বারা বিনয় প্রকাশই রুকূ-সিজদার প্রকাশ্য অর্থ। কিন্তু অন্তরের বিনয়ই ইহার আসল উদ্দেশ্য। ইহা সর্বজনবিদিত যে, সিজদার অর্থ হইল শরীরের সর্বোত্তম অঙ্গ মাটিতে স্থাপন করা এবং মাটি অপেক্ষা হীন ও নীচ আর কোন পদার্থই নাই। রুকূ-সিজদা এই জন্য নির্ধারিত হইয়াছে যে, তুমি জানিতে পারিবে, মাটিই তোমার মূল পদার্থ এবং পরিশেষে তোমাকে মাটির সঙ্গেই মিশিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিলে মাটির যেমন অহংকার নাই তদ্রূপ তোমারও অহংকার থাকিবে না এবং নিজের অসহায়তা ও দীনতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

নামাযের প্রত্যেক কাজেই তদ্রূপ এক একটি মর্মার্থ আছে। ইহা হাসিলে অবহেলা করিলে নামাযের বাহ্য অবয়ব ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইবে না।

কিরআত ও নামাযে যিকিরসমূহের হাকীকত ঃ নামাযে যে সকল কলেমা পাঠ করা হয় উহার প্রত্যেকটিরই এক একটি গূঢ় তাৎপর্য আছে। ইহা জানিয়া লওয়া আবশ্যক যেন নামাযীর মন সেই তাৎপর্যের অনুরূপ হয় এবং নামাযী নিজ উক্তিতে সত্য বলিয়া পরিগণিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর, যেমন 'আল্লাহু আকবার' বাক্যটির অর্থ বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করা হইতে আল্লাহ্ বহু উর্ধ্বে। এই অর্থ যে না জানে সে মূর্খ। আবার এই অর্থ জানা থাকিলেও তাহার অন্তরে অন্য কোন পদার্থ আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা থাকিলে 'আল্লাহু আকবার' উক্তিতে সে মিথ্যাবাদী। এইরূপ নামাযীকে বলা হইবে, এই বাক্যটি তো নিঃসন্দেহে সত্য; কিন্তু তুমি মিথ্যা বলিতেছ। মানুষ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের প্রতি অধিক অনুগত হইলে তাহার নিকট সেই পদার্থটি আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে। যাহার প্রতি সে আনুগত্য প্রকাশ করিতেছে উহাকেই' তাহার উপাস্য ও আল্লাহ্ বলা যাইতে পারে। এই মর্মেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ ـ

অর্থাৎ "তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিজের উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে?" وجهت وجهى বলার মর্মার্থ এই, 'আমি সমস্ত বিশ্বজগত হইতে অন্তরকে ফিরাইয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে ইহাকে নিবিষ্ট করিলাম।' এই সময় হৃদয় অন্য কোন পদার্থের দিকে আকৃষ্ট থাকিলে এই উক্তি মিথ্যা হইল। আল্লাহ্‌র নিকট মুনাজাতের সময় প্রথমে উক্তিটিই মিথ্যা হইলে ইহার বিপদ অতি সুস্পষ্ট। অতঃপর 'হানিফাম মুসলিমান' বলিবার সময় মুসলমান বলিয়া দাবি করা হইল। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"যে ব্যক্তির হস্ত ও রসনা হইতে লোকে নিরাপদে থাকে সে-ই প্রকৃত মুসলমান।" অতএব, 'হানীফাম মুসলিমান' শব্দসমূহ উচ্চারণকারী হাদীসোক্ত গুণে বিভূষিত হওয়া আবশ্যক অথবা এইরূপে উক্তি করিবার সময় অন্তত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে, 'এখন হইতে আমি ঐ গুণে বিভূষিত হইব।' 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলিবার সময় আল্লাহ্-প্রদত্ত অনুগ্রহরাশি স্মরণপূর্বক হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার ভাব বৃদ্ধি করা আবশ্যক। কারণ, এই কলেমাটি কৃতজ্ঞতা ব্যঞ্জক এবং হৃদয় দ্বারাই কৃতজ্ঞতা হইয়া থাকে। اياك نعبد বলিবার সময় অকপটতার ভাব হৃদয়ে সজীব করিয়া তোলা কর্তব্য। اهدنا বলার সময় হৃদয় হইতে মিনতি ও ক্রন্দনের রোল উত্থাপন করা উচিত। কারণ, এই বাক্য দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট সৎপথ প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করা হয়। এইরূপ নামাযের মধ্যে তাসবীহ, তাহলীল, কিরাআত ইত্যাদি যাহা কিছু পাঠ করা হয়, তৎসমুদয় উচ্চারণকালে ঐ সমস্তের অর্থানুযায়ী ভাব গ্রহণ করা এবং অন্তরকে তদনুরূপ গুণে বিভূষিত করা কর্তব্য। এই সকলের বিবরণ অতি বিস্তৃত। নামায দ্বারা সৌভাগ্য লাভের আশা করিলে উল্লিখিতভাবে হৃদয়কে বিভূষিত করিতে হইবে। অন্যথায় অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ ব্যতীত আর কোন লাভই হইবে না।

নামাযে একাগ্রতা লাভের উপায় ঃ দুই কারণে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়। (১) বাহ্য কারণ ও (২) আভ্যন্তরিক কারণ। বাহ্য কারণ এই—কারণ নামাযের স্থানে দর্শন-শ্রবণের কোন কিছু বিদ্যমান থাকিলে মন সেই দিকে ধাবিত হয়। কেননা, মন চক্ষু-কর্ণের অধীন। জনশূন্য নীরব স্থানে নামায পড়িলে মন অন্য দিকে আকৃষ্ট হয় না। স্থান অন্ধকার হইলে বা চক্ষু বন্ধ করিয়া লইলে গভীর মনোনিবেশের জন্য উত্তম। অধিকাংশ আবেদ ইবাদতের জন্য অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহ তৈয়ার করিয়া লইতেন। কারণ, প্রশস্ত গৃহে মন এদিক-সেদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। হযরত ইবনে উমর (রা) নামাযে দাঁড়াইবার পূর্বে কুরআন শরীফ, তরবারি প্রভৃতি যাহা কিছু সঙ্গে থাকিত সমস্তই মন সেই দিকে আকৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় দূরে সরাইয়া রাখিতেন।

www.BANGLAKITAB.com

আভ্যন্তরিক কারণ হইল নানাবিধ দুশ্চিন্তা এবং ভয় ও আশঙ্কাজনিত চিত্তচাঞ্চল্য। ইহার প্রতিকার অতি দুঃসাধ্য ও নিতান্ত কঠিন। আভ্যন্তরিক কারণও আবার দুই প্রকার—(১) কোন কাজের প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ। প্রথমে কাজটি সমাধা করিয়া তৎপর নামাযে দণ্ডায়মান হওয়াই এই আকর্ষণ দূরীকরণের উপায়। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَالْعِشَاءُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ ـ

অর্থাৎ "আহার ও ইশার নামাযের সময় একযোগে উপস্থিত হইলে প্রথমে আহার করিয়া লইবে।" এইরূপ কোন কথা বলার প্রয়োজন থাকিলে তাহাও বলিয়া শেষ করত তৎপর নিশ্চিন্ত মনে নামাযে দাঁড়াইবে। (২) যে কাজের চিন্তা ও আশংকা অল্পক্ষণের মধ্যে নিঃশেষ হইতে পারে না অথবা এমন অনাহুত বাজে কল্পনারাশি যাহা অভ্যাসগতভাবে আপনা আপনিই অন্তররাজ্য আচ্ছন্ন করিয়া লইয়াছে, এই জাতীয় চিন্তা দূর করিবার উপায় এই—নামাযে যে সমস্ত তাসবীহ ও কিরাআত পাঠ করা হয় উহার অর্থের দিকে মনোনিবেশ করা। অর্থের দিকে ধ্যান রাখিলে হয়ত ঐ সমস্ত অনাহুত কল্পনা দূর হইয়া যাইবে। সেই কল্পনারাশি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া না পড়িলে এবং কোন কার্যের প্রতি মনের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল না হইয়া উঠিলে অর্থের দিকে মনোনিবেশের ফলে মনের ঐ সকল খেয়াল ছুটিয়া যাইবে। কিন্তু খাহেশ অত্যন্ত প্রবল হইলে অর্থের প্রতি মনোনিবেশের দ্বারা উহা বিদূরিত হইবে না। জোলাপ ব্যবহারে ইহার মূল অন্তর হইতে ছিন্ন করিতে হইবে। ইহার ব্যবস্থা এই—যে পদার্থের আকর্ষণ বা কল্পনা মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে তাহা বর্জন করা যেন ইহার চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইতে পার। কোন আকর্ষণীয় বস্তু সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করিলে ইহার চিন্তা হইতে কখনই মুক্ত থাকা যায় না। এমতাবস্থায় নামাযেও সেই চিন্তা সর্বদা মনের সহিত বিজড়িত থাকে। এরূপ নামাযীর অবস্থা বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মনে কর, এক ব্যক্তি বৃক্ষের নিচে উপবেশন করিল এবং চড়ুই পাখির চেঁচামেচি হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় ইহাদিগকে লাঠি দ্বারা তাড়াইতে আরম্ভ করিল। তাড়া পাইয়া ইহারা উড়িয়া গেল বটে, কিন্তু পর মুহূর্তেই ফিরিয়া আসিয়া বৃক্ষে উপবেশনপূর্বক কিচির-মিচির আরম্ভ করিয়া দিল। পাখির কিচির-মিচির হইতে অব্যাহতি পাইতে চাহিলে বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলা উচিত। কারণ, বৃক্ষটি যতকাল বিদ্যমান থাকিবে ততকাল পাখি আসিয়া উহাতে বসিবেই। তদ্রূপ কোন কার্যের আকর্ষণ যতদিন মনের মধ্যে প্রবলভাবে বদ্ধমূল থাকিবে ততদিন সেই বিষয়ক নানাবিধ অনাহুত চিন্তা উদিত হইয়া মনকে পেরেশান করিতে থাকিবে। এক ব্যক্তি রসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে একখানা উত্তম বস্ত্র উপহার দিলেন। ইহাতে একটি বড় বোটা অতি

চমৎকার ছিল। নামাযের সময় হযরত (সা)-এর দৃষ্টি বোটার উপর পড়িল। উক্ত কারণেই নামায শেষ হইলে তিনি বস্ত্রটি দেহ মোবারক হইতে খুলিয়া প্রদানকারীকে ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের পুরাতন বস্ত্র পরিধান করিলেন। একবার তাঁহার পবিত্র পাদুকাদ্বয়ে নূতন ফিতা লাগান হইল। নামায পড়িবার সময় সেই ফিতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইলে উহা সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। ইহাতে তিনি নূতন ফিতা খুলিয়া ফেলিয়া পূর্বতন পুরাতন ফিতা লাগাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। একবার তাঁহার জন্য একজোড়া নূতন পাদুকা তৈয়ার করা হইল। তাঁহার নিকট উহা সুন্দর বোধ হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি সিজদায় যাইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে আল্লাহ্, তোমার নিকট সকাতরে মিনতি করি, এই পাদুকাদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি করার অপরাধে আমাকে শত্রু মনে করিও না।" তৎপর তিনি বাহিরে আসিয়া সর্বপ্রথমে যে ভিক্ষুককে দেখিতে পাইলেন তাহাকেই পাদুকা জোড়াটি দান করিলেন।

একদা হযরত তাল্‌হা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু নিজ বাগানে নামায পড়িতেছিলেন। হঠাৎ বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে উড্ডীয়মান এক সুন্দর পাখির দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। পাখিটি বাহির হইবার পথ পাইতেছিল না। তাঁহার মন এই দিকে আকৃষ্ট হইল এবং কত রাকআত নামায পড়িলেন তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন। তৎপর তিনি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিলেন এবং ঐ অপরাধের কাফ্‌ফারাস্বরূপ উক্ত বাগানটি গরীব-দুঃখীর জন্য দান করিয়া দিলেন। পূর্বকালের বুযর্গগণ এইরূপ কার্যই করিতেন এবং উহাকে মনের একাগ্রতা রক্ষার উপায় মনে করিতেন।

মোটকথা, নামাযের প্রথম হইতে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মন আচ্ছন্ন না হইলে নামাযে একাগ্রচিত্ত হওয়া যায় না। আর যে চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে নামায দ্বারা তাহা বিদূরীত হয় না। একাগ্রচিত্ততার সহিত নামায পড়িতে চাহিলে নামাযের পূর্বেই হৃদয়ের চিকিৎসা করত নীরোগ অন্তরে নামাযে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। অন্তরকে রোগমুক্ত করিতে হইলে দুনিয়ার চিন্তা অন্তর হইতে দূর করিতে হয় এবং আবশ্যক পরিমাণ দুনিয়ার বস্তুতে পরিতুষ্ট থাকিতে হয়। আর নিশ্চিত মনে ইবাদতের সুযোগ লাভই আবশ্যক পরিমাণ পার্থিব সম্পদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অন্যথায় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নামাযে একাগ্রতা রক্ষা পাইবে না; বরং নামাযের কিছু অংশে একাগ্রতা রক্ষা হইবে। এমতাবস্থায় নফল নামাযের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে এবং এইরূপে একাগ্রতা রক্ষার চেষ্টা করিবে। মনে কর, চার রাকআত নামায পড়িবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছ; কিন্তু নামাযের মধ্যে একাগ্রতা নষ্ট হইল। এরূপ ক্ষেত্রে নফল নামাযের পরিমাণ যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি করিয়া উহার ক্ষতিপূরণ করিবে। কারণ, নফল নামাযে এই জাতীয় ত্রুটির ক্ষতিপূরণ হইয়া থাকে।

www.BANGLAKITAB.com

জামাআত সুন্নত হওয়ার প্রমাণ ঃ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"জামাআতের সহিত এক নামায একাকী সাতাইশ নামাযের সমান।" তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাআতে পড়িল সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদতে কাটাইল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়িল সে যেন সমস্ত রাত্র ইবাদতে কাটাইল।" তিনি আরও বলেন—"যে ব্যক্তি একাধারে চল্লিশ দিন প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায জামাআতে পড়িল এবং প্রথম তকবীর ছুটিল না, সে দুইটি বিষয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে—(১) কপটতা ও (২) দোযখ।" এই জন্যই পূর্বকালের বুযর্গগণের মধ্যে যাহার প্রথম তকবীর ছুটিয়া যাইত তিনি একাধারে তিন দিন শোক করিতেন এবং জামাআত ছুটিয়া গেলে সাত দিন ব্যাপিয়া শোক করিতেন। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব (রাঃ) বলেন—"আমি বিশ বৎসর যাবৎ আযানের পূর্বে মসজিদে পৌঁছিয়াছি।" অধিকাংশ আলিম বলেন—"যে ব্যক্তি বিনা ওযরে একাকী নামায পড়ে তাহার নামায দুরস্ত হয় না।" অতএব জামাআতে নামায পড়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া জানা উচিত।

ইমাম ও মুকতাদীরূপে নামাযের নিয়ম ঃ ইহার নিয়ম জানিয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মুকতাদিগণের আন্তরিক সন্তোষের সহিত ইমামত করা উচিত। তাহারা যাহাকে ঘৃণা করে তাহার ইমামত করা উচিত নহে। আবার মুকতাদিগণ কাহাকেও ইমাম বানাইলে বিনা ওযরে ইমামত অস্বীকার করাও তাহার পক্ষে উচিত নহে। কারণ, ইমামতের ফযীলত আযান দেওয়ার ফযীলত অপেক্ষা অনেক বেশি। ইমামত করিতে হইলে পরিধেয় বস্ত্রের পবিত্রতার দিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং নামাযের সময়ের প্রথম ভাগে নামায পড়িতে হইবে। জামাআতের প্রতীক্ষায় বিলম্ব করা উচিত নহে; কেননা সময়ের প্রথমভাগের ফযীলত জামাআতের ফযীলত অপেক্ষা অধিক। জামাআতের জন্য দুইজন উপস্থিত হইলে সাহাবাগণ তৃতীয় জনের অপেক্ষা করিতেন না এবং জানাযার নামাযের জন্য চারিজন উপস্থিত হইলে পঞ্চম জনের অপেক্ষা করিতেন না। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের একদা জামাআতে আসিতে বিলম্ব হইল। সাহাবা (রা)-গণ তাহার অপেক্ষা না করিয়া হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইমাম বানাইয়া নামায আরম্ভ করিলেন। এক রাকআত নামায পড়া হইয়া গেলে রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জামাআতে শামিল হইলেন। নামায শেষে তাঁহাকে দেখিয়া সাহাবাগণ ভীত হইলেন। হযরত (সা) তাহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা উত্তম কাজ করিয়াছ। সর্বদা এইরূপই করিবে।"

একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইমামত করিবে, ইমামতের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবে না। কাতার সোজা না হওয়া পর্যন্ত তকবীর বলিবে না। নামাযের সমস্ত তকবীর উচ্চস্বরে বলিবে। ইমাম জামাআতের সওয়াব লাভের আশায়

ইমামতের নিয়ত করিবে। ইমামতের নিয়ত না করিলে জামাআত দুরস্ত হইবে; কিন্তু ইমাম জামাআতের সওয়াব পাইবে না। মাগরিব, ইশা, ফজরের নামাযের প্রথম দুই রাকআতে এবং জুম'আ ও উভয় ঈদের নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পড়িবে। নামাযের মধ্যে তিন বার তিন স্থানে বিরাম লইবে—(১) তকবীরে তাহরীমা বাঁধিয়া انى وجهت وجهى الخ পড়িবার পর; এই সময় মুকতাদিগণ সূরা ফাতিহা পড়িতে আরম্ভ করিবে; (২) সূরা ফাতিহা পড়িবার পর একটু বিরাম লইয়া অন্য সূরা পড়িবে। যে সকল মুকতাদী সূরা ফাতেহা পূর্ণ করে নাই বা মোটেই পড়ে নাই, তাহারা এই অবসরে সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করিয়া লইবে। (হানাফী মতে মুকতাদীদের সূরা ফাতিহা পড়িতে হয় না)। (৩) কিরাআত সমাপ্ত হইলে এতটুকু বিরামের পর রুকূতে যাইবে যাহাতে রুকূর তকবীর সূরার সাথে মিলিয়া না যায়। মুকতাদী ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতিহা ব্যতীত আর কিছুই পড়িবে না কিন্তু দূরে থাকার কারণে ইমামের কিরাআত শুনিতে না পাইলে এবং ইমাম রুকূ-সিজদায় তাড়াতাড়ি করত তিনবারের অধিক তসবীহ না বলিলে পড়া যাইতে পারে।

হযরত আনাস (রা) বলেন যে, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নামাযের ন্যায় হালকা ও পূর্ণ নামায আর কাহারও ছিল না। জামাআতে বৃদ্ধ, দুর্বল বা এমন লোক থাকিতে পারে যাহার কোন অত্যাবশ্যক কাজ আছে, তাদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি নামায হালকা করিতেন। মুক্‌তাদী ইমামের একেবারে সমানে সমানে কোন রুকন আদায় না করিয়া একটু পরে করিবে। যেমন, ইমামের কপাল ভূমিতে লাগিবার পূর্বে মুক্‌তাদী রুকূতে যাইবে না। ইহাকেই ইমামের অনুসরণ বলে। মুক্‌তাদী ইমামের পূর্বে রুকূ-সিজদায় গেলে তাহার নামায বাতিল হইবে। সালাম ফিরাইবার পর এই দু'আ পড়া পর্যন্ত বসিয়া থাকিবে—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ اِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعْلَيْتَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔

অর্থাৎ হে আল্লাহ্, তুমিই শান্তি, তোমা হইতেই শান্তি আগমন করে এবং তোমার দিকেই শান্তি প্রত্যাবর্তন করে। অনন্তর হে আল্লাহ্ আমাদিগকে শান্তির সহিত জীবিত রাখ এবং আমাদিগকে শান্তির আলয়ে প্রবেশ করাও হে আল্লাহ্, তুমি মঙ্গলময় তুমি অতি মহান, হে প্রতাপশালী ও করুণা সিন্ধু।" তৎপর অবিলম্বে মুক্‌তাদীর দিকে মুখ ফিরাইয়া মুনাজাত করিবে। জামাআত হইতে ইমামের পূর্বে উঠিয়া যাওয়া মাকরূহ; কাজেই ইমামের পূর্বে মুকতাদী উঠিবে না।

www.BANGLAKITAB.com

জুম'আ নামাযের ফযীলত ঃ শুক্রবার শ্রেষ্ঠ দিন এবং ইহার ফযীলত অনেক। ইহা মুসলমানদের ঈদের দিন। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বিনা ওযরে তিন জুম'আ কাযা করিল সে ইসলাম হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং তাহার হৃদয়ে মরিচা পড়িয়া গেল।' হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, শুক্রবারে আল্লাহ্ ছয় লক্ষ বান্দাকে দোযখ হইতে মুক্তি দিয়া থাকেন। হযরত (সা) বলেন—প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় দোযখের আগুনকে অধিক মাত্রায় প্রজ্বলিত করা হয়; এই সময় নামায পড়িও না। কিন্তু শুক্রবারে তাহা করা হয় না। তিনি আরও বলেন—যে ব্যক্তি শুক্রবারে ইন্তেকাল করে সে শহীদের সওয়াব পাইবে এবং কবর আযাব হইতে অব্যাহতি পাইবে।

জুম'আর নামাযের শর্ত ঃ অন্যান্য নামাযের যে সমস্ত শর্ত আছে জুম'আর নামাযের জন্য সেই সকল শর্ত তো আছেই, তদুপরি জুম'আর জন্য আরও ছয়টি শর্ত রহিয়াছে ঃ (১) সময়। ইমাম জুম'আর নামাযের সালাম ফিরাইবার পূর্বে আসরের সময় আসিয়া পড়িলে জুম'আর নামায নষ্ট হইবে; এমতাবস্থায় জোহরের নামায পড়িতে হইবে। (২) স্থান। জুম'আর নামায ময়দানে ও তাঁবুর মধ্যে দুরস্ত নহে; বরং ইহার জন্য শহর হইতে হইবে; অথবা যে গ্রামে কমপক্ষে চল্লিশজন স্বাধীন, বুদ্ধিমান, বালেগ ও স্থায়ী পুরুষ বাসিন্দা বাস করে এমন স্থানে মসজিদে না পড়িয়া অন্য জায়গায় পড়িলেও জুম'আর নামায দুরস্ত হইবে। (৩) মুসল্লীর সংখ্যা অন্ততপক্ষে চল্লিশজন বুদ্ধিমান, বালেগ, স্বাধীন ও স্থায়ী পুরুষ বাসিন্দা জামাআতে উপস্থিত না হইলে জুম'আর নামায দুরস্ত হইবে না। (হানাফী মতে ইমাম ব্যতীত তিনজন পুরুষ উপস্থিত হইলেই নামায দুরস্ত হইব)। খুৎবার সময় কিংবা নামাযে ইহা অপেক্ষা কম লোক উপস্থিত হইলেই বুঝিবে যে, নামায দুরস্ত হইবে না। (৪) জামাআত। উক্ত সংখ্যক লোক পৃথক পৃথক নামায পড়িলে নামায দুরস্ত হইবে না। কোন ব্যক্তি শেষ রাকআত পাইলে অপর এক রাকআত একাকী পড়িলেও তাহার নামায সহীহ্ হইবে। দ্বিতীয় রাকআতের রুকূ না পাইলে ইমামের পিছনে ইকতেদা করিবে বটে, কিন্তু জোহরের নামাযের নিয়ত করিবে। (৫) অন্য লোকেরা যেন, প্রথমে জুম'আর নামায পড়িয়া না ফেলে। কারণ, একই শহরে জুম'আর জামাআত একবারের অধিক হওয়া উচিত নহে। কিন্তু শহর যদি এত বড় হয় যে, এক জামে মসজিদে সমস্ত মুসল্লীর স্থান সংকুলান না হয় অথবা দূর-দূরান্ত হইতে সকল মুসল্লীর পক্ষে ঠিক সময়ে মসজিদে আসা কষ্টকর হয়, তবে একই শহরে একাধিক জুম'আর জামাআত করাতে কোন দোষ নাই। একই মসজিদে বিনা কষ্টে শহরবাসী সকল লোকের সমাবেশ হইলেও যদি একাধিক মসজিদে নামায পড়া হয় তবে যে জামাআত তাকবীরে তাহরীমা আগে বাঁধিয়াছে সেই জামাআতের নামাযই সহীহ্ হইবে। (৬) নামাযের পূর্বে দুই খুৎবা পড়া ফরয। দুই খুৎবার মধ্যে কিছুক্ষণ বসাও ফরয। উভয় খুৎবা দাঁড়াইয়া পড়াও ফরয। প্রথম খুৎবার মধ্যে চারিটি ফরয—(ক) আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা করা। এইজন্য 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলাই যথেষ্ট। (খ) দরূদ শরীফ পাঠ করা। (গ) আল্লাহ্কে ভয় করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করা। এইজন্য أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللّٰه "আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্কে ভয় করিবার জন্য উপদেশ দিতেছি" বলিলেই যথেষ্ট। (ঘ) কুরআন শরীফের এক আয়াত পাঠ করা। দ্বিতীয় খুৎবাতেও চারিটি ফরয আছে। প্রথম খুৎবার প্রথমোক্ত তিনটি এবং অপরটি হইল আয়াতের পরিবর্তে কোন দু'আ পড়া। স্ত্রীলোক, ক্রীতদাস নাবালেগ ও মুসাফিরের উপর জুম্'আর নামায ফরয নহে।

ওযরে জুম'আর নামায না পড়া জায়েয ঃ পথে ভয়ানক কাদা, বৃষ্টি, নিজে পীড়িত হওয়া কিংবা কোন নিঃসহায় রোগীর সেবা-শুশ্রূষা-কার্যে আবদ্ধ থাকার দরুন জুম'আর নামাযে হাযির হইতে অক্ষম হইলে জুম'আর নামায না পড়া জায়েয আছে। কিন্তু এইরূপ ওযরবিশিষ্ট লোকের পক্ষে জুম'আর নামায শেষ হওয়ার পর জোহরের নামায পড়া উত্তম।

জুম'আর আদবসমূহ ঃ জুম'আর দিনের যথাযথ সম্মান করা উচিত। জুম'আর দিনে দশটি সুন্নত ও নিয়ম পালনে তৎপর হওয়া আবশ্যক। (১) বৃহস্পতিবারে সমস্ত সামান ঠিক করত আন্তরিক আগ্রহের সহিত জুম'আর দিনকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবার জন্য প্রস্তুত হইবে—যেমন, সাদা বস্ত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া লইবে। হাতের কর্তব্য কর্মসমূহ সমাধা করিয়া ফেলিবে যেন পরদিন প্রাতে মসজিদে উপস্থিত হইতে পারে। বৃহস্পতিবার আসরের সময় অন্তর হইতে পার্থিব সকল চিন্তা দূর করত তাসবীহ ও ইস্তেগফারে ব্যাপৃত হইবে। কারণ, এই সময়ের ফযীলত খুব বেশি। পর দিবস জুম'আর ফযীলতের মতই এই সময়ের ফযীলত। আলিমগণ বলেন, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে স্ত্রীসহবাস করা সুন্নত যেন জুম'আর দিনে উভয়ের উপর গোসল ফরয হইয়া পড়ে। (২) নামাযের সময়ের পূর্বেই মসজিদে যাইতে চাহিলে প্রাতেই গোসল সম্পন্ন করিবে; অন্যথায় বিলম্বে গোসল করাই উত্তম। জুম'আর দিনে গোসলের জন্য রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খুব তাকিদের সহিত নির্দেশ দিয়াছেন। এই কারণে কতিপয় আলিম জুম'আর গোসলকে ফরয মনে করিয়াছেন এবং মদীনাবাসিগণ কাহাকেও কঠোর গালি দিবার ইচ্ছা করিলে বলেন, "যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে না তুমি সেই ব্যক্তি হইতেও মন্দ।" জুম'আর দিনে ফরয গোসলের আবশ্যক হইলে গোসলের সময় জুম'আর গোসলের নিয়তে কিছু পানি শরীরে ঢালিয়া দেওয়া উত্তম। একই গোসলে অপবিত্রতা দূরীকরণ এবং জুম'আর সুন্নত গোসল, এই উভয়বিধ নিয়ত করিলেই যথেষ্ট হইবে; ইহাতে জুম'আর গোসলের সওয়াবও পাওয়া যাইবে। (৩) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া পবিত্র পোশাক

www.BANGLAKITAB.com

পরিধান করত পরিপাটি ও সুন্দর বেশে মসজিদে যাইবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার অর্থ এই যে, মাথার চুল মুণ্ডাইবে, নখ কাটিবে, গোঁফ ছাটিবে। ইতিপূর্বে হাম্মামে এই সমস্ত কাজ করিয়া থাকিলে উহাই যথেষ্ট। পরিপাটি হওয়ার অর্থ এই যে, সাদা পোশাক পরিধান করিবে, কারণ, সাদা পোশাক আল্লাহ্ সর্বাধিক পছন্দ করেন এবং মসজিদ ও নামাযের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিয়তে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিবে। ইহাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হইবে। অন্যথায় দুর্গন্ধে অপর লোকে বিরক্ত হইয়া গীবত করিবে। (৪) প্রত্যুষেই জামে মসজিদে চলিয়া যাইবে; ইহার ফযীলত খুব বেশি। প্রাচীনকালের লোকেরা প্রদীপ জ্বালাইয়া অতি প্রত্যুষে মসজিদে গমন করিতেন। ফলে যাত্রীদের এত ভিড় হইত যে, পথচলা দুষ্কর হইত। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) একদা তিন ব্যক্তিকে তাঁহার পূর্বে মসজিদে উপস্থিত দেখিয়া নিজের উপর রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, "আমি চতুর্থ পর্যায়ে পড়িলাম। আমার পরিণাম কি হইবে?" কথিত আছে যে, অতি প্রত্যুষে মসজিদে গমনের রীতি পরিত্যাগরূপ বিদ্আতই ইসলাম ধর্মে সর্বপ্রথম প্রকাশ পাইয়াছে। ইয়াহুদ ও খ্রিস্টানগণ শনি ও রবিবারে অতি প্রত্যুষে নিজ নিজ উপাসনালয়ে গমন করিয়া থাকে অথচ মুসলমানগণ নিজেদের জুম্'আর দিনে প্রত্যুষে মসজিদে গমন করে না। এমতাবস্থায় তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে?

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুম্'আর মসজিদে সর্বপ্রথম উপস্থিত হইবে সে একটি উট কুরবানীর সওয়াব পাইবে; দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি গরু কুরবানীর এবং তৃতীয় ব্যক্তি একটি ছাগল কুরবানীর সওয়াব লাভ করিবে। আর চতুর্থ ব্যক্তি একটি মোরগ ও পঞ্চম ব্যক্তি একটি ডিম দান করার সওয়াব পাইবে। ইমাম খুৎবার জন্য স্বীয় প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইলে কুরবানীর সওয়াব লিখক ফেরেশতা কাগজ ভাঁজ করিয়া রাখিয়া খুৎবা শ্রবণে লিপ্ত হন। ইহার পর যাহারা মসজিদে আসে তাহারা নামাযের সওয়াব ব্যতীত অতিরিক্ত কোন সওয়াব পায় না। (৫) মসজিদে বিলম্বে আসিয়া অপরের ঘাড়ে পা রাখিয়া সম্মুখের সারির দিকে যাওয়া উচিত নহে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি পিছন হইতে উল্লম্ফনপূর্বক সম্মুখের সারিতে যায়, কিয়ামতের দিন তাহাকে পুলের আকারে স্থাপন করিয়া অন্য লোককে তাহার উপর দিয়া পার করা হইবে। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে এরূপ উল্লম্ফনপূর্বক সম্মুখের সারিতে গিয়া নামায শেষ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি জুম'আর নামায কেন পড়িলে না?" সে ব্যক্তি নিবেদন করিলেন—"ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি তো আপনার সঙ্গেই নামায পড়িলাম।" হযরত (সা) বলিলেন—"আমি দেখিলাম, অপরের ঘাড়ে পা রাখিয়া তুমি সম্মুখের সারিতে চলিয়া গেলে। যে ব্যক্তি এইরূপ করে সে যেন নামাযই পড়ে নাই।" সামনের সারিতে শূন্যস্থান থাকিলে তথায় যাওয়ার চেষ্টা করা দুরস্ত আছে। কারণ

সম্মুখের সারিতে স্থান শূন্য রাখিয়া যাহারা পিছনে দাঁড়াইয়াছে সে-ত্রুটি তাহাদের। (৬) নামাযে রত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া যাইবে না। কারণ, নামাযে রত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া যাওয়া নিষেধ। হাদীস শরীফে আছে যে, নামাযে রত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করা অপেক্ষা মাটি হইয়া বরবাদ হওয়া ভাল। (৭) প্রথম সারিতে স্থান লাভের চেষ্টা করিবে। তাহা সম্ভব না হইলে ইমামের যত নিকটে দাঁড়ান যায় ততই ভাল। ইহাতে বড় ফযীলত আছে। কিন্তু প্রথম সারিতে সৈন্য কিংবা রেশমী পোশাক পরিহিত লোক থাকিলে অথবা স্বয়ং খুৎবা পাঠকারী কাল বর্ণের রেশমী পোশাক পরিহিত থাকিলে, কিংবা তাহার তরবারিতে স্বর্ণের কারুকার্য থাকিলে অথবা অপর কোন মন্দ কার্য পরিলক্ষিত হইলে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। কারণ, যে-স্থানে মন্দ আচরণ অনুষ্ঠিত হয় তথায় ইচ্ছাপূর্বক বসা উচিত নহে। (৮) ইমাম খুৎবা পাঠের জন্য প্রস্তুত হইলে কাহারও কথাবার্তা বলা উচিত নহে; বরং আযানের শব্দের উত্তর প্রদান এবং খুৎবা শ্রবণে মনোনিবেশ করা সকলেরই কর্তব্য। কেহ কথা বলিলে নিজে কথা না বলিয়া ইশারায় তাহাকে নীরব করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ রসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি খুৎবার সময় অপরকে বলে 'চুপ কর' অথবা 'খুৎবা শ্রবণ কর' সে বেহুদা কথা বলিল এবং যে ব্যক্তি এই সময় বেহুদা কথা বলে সে জুম'আর সওয়াব পাইবে না।" ইহা হইতে দূরে থাকার কারণে খুৎবা শুনিতে না পাইলে চুপ থাকা কর্তব্য। যে স্থানে লোকে কথাবার্তা বলে তথায় বসিবে না। খুৎবার সময় তাহিয়াতুল মসজিদ নামায ব্যতীত অন্য নামায পড়িবে না। (হানাফী মতে এই সময় কোন নফল-সুন্নত নামায জায়েয নহে)। (৯) জুম'আর নামায শেষ করিয়া আলহামদুলিল্লাহ, কুলহুওয়াল্লাহ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস ও এই চারিখানা সূরা সাতবার করিয়া পড়িবে। কারণ, হাদীস শরীফে আছে, জুম্'আর নামাযের পর এই সূরাসমূহ পাঠ করিলে পরবর্তী জুম্'আ পর্যন্ত শয়তান হইতে নিরাপদে থাকা যায়। তৎপর এই দু'আ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِءُ يَا مُعِيْدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ اَكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ اَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, হে অভাবহীন, হে প্রশংসিত, হে সৃজনকারী, হে পুনর্জীবন প্রদানকারী, হে করুণাময়, হে বন্ধু, তোমার হালাল বস্তু দ্বারা তোমার নিষিদ্ধ বস্তু হইতে এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা তোমা ছাড়া অপর সমস্ত কিছু হইতে আমাকে অভাবশূন্য কর। বুযর্গগণ বলেন, যে ব্যক্তি এই দু'আ সর্বদা পড়িবে সে কল্পনাতীত স্থান হইতে স্বীয় জীবিকা পাইতে থাকিবে এবং কখনও পরমুখাপেক্ষী হইবে না।

www.BANGLAKITAB.com

তৎপর ছয় রাকআত সুন্নত নামায পড়িবে, কারণ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই পরিমাণ নামায পড়িতেন। (১০) আসরের নামায পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করিবে। মাগরিব পর্যন্ত থাকিতে পারিলে অতি উত্তম। আলিমগণ বলেন, ইহাতে এক হজ্জ এক উমরার সওয়াব পাওয়া যায়। একান্তই যদি মস্‌জিদে অবস্থান করা না যায় এবং গৃহে চলিয়া যাইতে হয় তবুও আল্লাহ্‌র যিকির হইতে মুহূর্তকালও গাফিল থাকিবে না। তাহা হইলে জুম'আর দিনে যে একটি অতি মুবারক মুহূর্ত আছে উদাসীনভাবে তাহা নষ্ট হইবে না এবং ইহার ফযীলত হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে না।

জুম'আর দিনের কার্য ঃ জুম্‌আর দিনে সাতটি নেক কাজে তৎপর থাকা উচিত। (১) প্রত্যুষে যে স্থানে ইলমে দীনের চর্চা হয় এমন মজলিসে যোগদান করিবে। বাজে গল্পের বৈঠক হইতে দূরে থাকিবে। এমন বুযর্গের মজলিসে হাযির হইবে যাঁহার উপদেশ শ্রবণে ও কার্যাবলী দর্শনে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং পরকালের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়। যাহার উক্তিতে এইরূপ প্রভাব নাই তাহার মজলিসকে ইলমে দীনের মজলিস বলা যায় না। যাহার উক্তিতে উক্তরূপ প্রভাব আছে এমন ব্যক্তির মজলিসে হাযির হওয়া হাজার রাকআত নফল নামায অপেক্ষা উত্তম বলিয়া হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। (২) জুম'আ দিনে একটি অতি মুবারক মুহূর্ত আছে। হাদীছ শরীফে আছে, সেই মুহূর্তে আল্লাহ্‌র নিকট যাহা চাওয়া হয় তাহাই কবূল হয়। এই শুভ মুহূর্ত নির্ধারণে মতভেদ আছে। কোন কোন আলিমের মতে তাহা সূর্যোদয়ের সময় অথবা দ্বিপ্রহরের ঠিক পর মুহূর্তে বা সূর্যাস্তের সময়। কেহ কেহ বলেন, সেই মুবারক মুহূর্তটি জুম'আর আযানের সময়, ইমাম খুৎবার জন্য মিম্বরে যাওয়ার কালে, জুম'আর নামাযে দাঁড়াইবার সময় অথবা আসরের নামাযের সময় হইয়া থাকে। মোটকথা, সেই মুবারক মুহূর্তের নির্দিষ্ট সময় কেহই অবগত নহে। শবে কদরের ন্যায় ইহা গুপ্ত। অতএব সেই শুভ মুহূর্তের অনুসন্ধানে সমস্ত দিন আল্লাহ্‌র যিকিরে লিপ্ত থাকা উচিত। (৩) প্রচুর পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। কারণ, রসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে আশিবার আমার উপর দরূদ পড়িবে তাহার আশি বৎসরের (সগীরা) গুনাহ্‌ মাফ হইবে।" সাহাবাগণ আরয করিলেন—"ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, আপনার উপর কি প্রকারে দরূদ শরীফ পড়িব?" তিনি বলিলেন—"তোমরা বল ঃ"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًى وَّلِحَقِّهٖ

اَدَاءً وَّاَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَاَجْزِهٖ عَنَّا مَاهُوَ اَهْلُهٗ وَ اَجْزِهٖ اَفْضَلَ مَاجَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্‌, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার পরিবারবর্গের উপর এমন রহমত নাযিল কর যাহাতে তোমার সন্তুষ্টি রহিয়াছে এবং যাহাতে তাঁহার প্রতি আমাদের হক আদায় হয়। আর তাঁহাকে শাফাআতের ক্ষমতা, মাহাত্ম্য এবং মাকামে মাহ্‌মুদ দান কর যাহা তুমি তাঁহাকে প্রদানের ওয়াদা করিয়াছ। আর যে পুরস্কারের তিনি উপযুক্ত আমাদের পক্ষ হইতে তুমি তাঁহাকে উহা দান কর। আর তাঁহার উম্মতের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এমন উৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রদান কর যাহা তুমি কোন পূর্ববর্তী নবীকে দান করিয়াছ। আর তাঁহার নবী ও পুণ্যবান ভ্রাতৃবৃন্দের উপর রহমত নাযিল কর, হে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" কথিত আছে, যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সাতবার দরূদ শরীফ পড়িবে সে অবশ্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শাফাআত লাভ করিবে। এই দরূদ পড়িলেও চলিবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্‌, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল কর।" (৪) জুম'আর দিনে অধিক পরিমাণে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করিবে এবং সূরা কাহাফ পড়িবে। হাদীস শরীফে এই সূরার অনেক ফযীলত বর্ণিত আছে। পূর্বকালের আবেদগণ জুম'আর দিনে সূরায় ইখলাস, দরূদ শরীফ, ইস্তেগফার ও নিম্নলিখিত দু'আ হাজার হাজার বার পড়িতে অভ্যস্ত ছিলেন—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

অর্থাৎ "আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য। আল্লাহ্‌ ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য আর কেহই নাই এবং আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ।" (১) শুক্রবারে নফল নামায অধিক পরিমাণে পড়িবে। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি জামে মসজিদে পৌঁছামাত্রই এই নিয়মে চারি রাকআত নফল নামায পড়ে যে, প্রত্যেক রাকআতে একবার সূরা ফাতিহা ও পঞ্চাশবার সূরা ইখলাস পাঠ করে, সে ব্যক্তি বেহেশতে নিজের স্থান না দেখিয়া অথবা অপর কাহারও নিকট হইতে এই সুসংবাদ শ্রবণ না করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিবে না। জুম'আর দিন চারি রাকআত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব এবং এই নামাযে 'আন্‌আম', 'কাহাফ', 'তা-হা' ও 'ইয়াসীন', এই চারি সূরা পড়িবে। এই সূরাগুলি পড়িতে না পারিলে 'লুকমান', 'সিজদা', 'দুখান' ও 'মুলক' এই চারি সূরা পড়িবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) জুম'আর দিন সর্বদা 'সালাতুত

www.BANGLAKITAB.com

তাসবীহ' পড়িতেন। এই নামায সর্বজনবিদিত। অতি উত্তম নিয়ম এই যে, জুম'আর দিন দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত নফল নামায পড়িবে, জুম'আর নামাযের পর আসরের নামায পর্যন্ত ইলমে-দীন চর্চার মজলিসে উপস্থিত থাকিবে এবং তৎপর মাগরিবের নামায পর্যন্ত তসবীহ ও ইস্তেগফার পড়িতে থাকিবে। (৬) জুম'আর দিন কিছু না কিছু অবশ্যই খয়রাত করিবে; কিছু না থাকিলে এক টুকরা রুটি হইলেও দান করিবে। কারণ, জুম'আর দিনে দানের ফযীলত অনেক বেশি। খুৎবার সময় কোন ভিক্ষুক কিছু চাহিলে তাহাকে ধমক দেওয়া উচিত। এই সময় কিছু দান করা মাকরূহ। (৭) সপ্তাহের মধ্যে জুম'আর দিনকে পরকালের কাজের জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিবে; বাকি ছয় দিন দুনিয়ার কাজ করিবে। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ "অনন্তর যখন নামায শেষ হইবে তখন ধরাপৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ্র রহমত অন্বেষণ কর।" হযরত আনাস (রা) বলেন, ক্রয়-বিক্রয়, এবং সাংসারিক কাজকর্ম এই আয়াতের মর্ম নহে; বরং ইল্ম অনুসন্ধান, প্রিয়জনের সাক্ষাত, পীড়িত ব্যক্তির দর্শন, জানাযার সহিত কবরস্থানে গমন এবং এবম্বিধ অন্যান্য কাজ এই আয়াতের মর্ম।

নামাযের নিয়তের মর্ম ও ওয়াসওয়াসা বিদূরণ ঃ নামাযের অতি প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলি উপরে বর্ণিত হইল। অন্যান্য প্রয়োজনীয় মাসআলাসমূহ আলিমের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া উচিত। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে নামাযের সমস্ত মাসআলা বর্ণনা করা সম্ভব নহে। অপর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, নামাযের নিয়তে অধিকাংশ সময় ওয়াসওয়াসা বা বাজে চিন্তা আসিয়া পড়ে। তিন কারণে এইরূপ ওয়াসওয়াসা হইয়া থাকে। (১) মানসিক অসুস্থতা, (২) চিত্তচাঞ্চল্য, (৩) শরীয়তের বিধান এবং নিয়তের মর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা অর্থাৎ যে সংকল্প মানুষকে আল্লাহ্র আদেশ পালনে প্রবৃত্ত করে তাহাকেই যে নিয়ত বলে, এই তাৎপর্য না জানা। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, কোন আলিমের আগমন সংবাদ কেহ তোমাকে প্রদানপূর্বক তাঁহার সম্মানার্থে যদি দাঁড়াইতে বলে তবে এই কথা শোনামাত্র তাঁহার ইল্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তোমার অন্তরে এক প্রকার ইচ্ছার সঞ্চার হইবে। সেই ইচ্ছাই তোমাকে দণ্ডায়মান করাইয়া দেয়। এই ইচ্ছাকেই নিয়ত বলে। মনে মনে বা মুখের কোন উক্তি ব্যতীতই নিয়ত তোমার অন্তরে থাকে। তুমি মনে মনে বা মুখের নিয়ত নহে; ইহা ইন্দ্রিয়ের কার্য। যে ইচ্ছা তোমার হৃদয়ে প্রেরণা দান করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত করে তাহাকেই নিয়ত বলে। নিয়তের বিধান জানিয়া লওয়া আবশ্যক। তুমি যে নামায পড়িতে প্রস্তুত হইয়াছ তাহা জোহর কি আসরের নামায মনে মনে স্থির করিয়া "আল্লাহু আকবর' বলিয়া তাহরিমা বাঁধিলেই হইল। মন অন্যমনস্ক থাকিলে ওয়াক্তের নাম স্মরণ করিয়া লইবে। ইহা

ধারণা করিও না যে, যে নামায পড়িতেছ তাহা ফরয, কি ওয়াজিব; জোহর কি আসরের; এই সকল বিষয় এক সঙ্গে বিস্তৃতভাবে মনে জমাইয়া লইতে হইবে; বরং তন্মধ্যে যখন যেটি মনে আসে ক্রমান্বয়ে উহা মনে জমাইয়া লইলেই নিয়তের জন্য যথেষ্ট। কারণ কেহ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, "জোহরের নামায পড়িয়াছ কি?" উত্তরে তুমি বলিবে 'হ্যাঁ'। 'হ্যাঁ' বলিবার সময় তোমার হৃদয়ে এই সমস্তের মোটামুটি অর্থ উদয় হয় বটে; কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ হৃদয়ে উদিত হয় না। এইরূপ তোমার নামাযের ওয়াক্তের নাম স্মরণ করা উক্ত লোকটির জিজ্ঞাসাতুল্য এবং তাকবীরে তাহ্রীমা বাঁধিতে যাইয়া 'আল্লাহু আকবর' বলা তোমার 'হ্যাঁ' বলা সদৃশ। ইহার অতিরিক্ত করিতে চাহিলে মন অস্থির হইয়া পড়িবে এবং নামাযও ঠিক হইবে না। নামাযে সহজ পন্থা অবলম্বন করা উচিত। উল্লিখিতরূপে নিয়ত করিতে পারিলে তৎপর যে-অবস্থাই হউক, জানিতে হইবে যে, নামায জায়েয হইয়াছে। কারণ, নামাযের নিয়তও অন্যান্য কার্যের নিয়তের ন্যায়। এই জন্যই রসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সময়ে কাহারও নিয়তে ওয়াসওয়াসা হইত না। কারণ, তাঁহারা জানিতেন যে, ইহা সহজ এবং যে-ব্যক্তি ইহাকে সহজ বলিয়া মনে করে না সে নির্বোধ।

www.BANGLAKITAB.com

পঞ্চম অধ্যায়

যাকাত

যাকাত ইসলামের ভিত্তিসমূহের অন্যতম। কারণ, রসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—(১) কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ,' (২) নামায, (৩) যাকাত, (৪) রোযা ও (৫) হজ্জ।" হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য নিজেদের অধিকারে রাখিয়া উহার যাকাত না দেয়, পরলোকে এই স্বর্ণ-রৌপ্য পোড়াইয়া তাহাদের প্রত্যেকের বক্ষস্থলে এমন দাগ দেওয়া হইবে যে, তাহা বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। আর যে-ব্যক্তি পশু আপন অধিকারে রাখিয়া যাকাত না দেয় পরকালে এই পশুগুলিকে তাহার উপর শাস্তি প্রদানে নিযুক্ত করা হইবে; পশুগুলি তাহাকে ঢুঁ মারিতে ও পদদলিত করিতে থাকিবে। অগ্র-পশ্চাতের সকল পশু যখন তাহাকে একবার করিয়া এইরূপ শাস্তি দিয়া শেষ করিবে তখন প্রথম হইতে আবার ইহারা আসিয়া তাহাকে পূর্ববৎ পর্যায়ক্রমে শাস্তি দিতে থাকিবে। কিয়ামত দিবসে সকলের হিসাব-নিকাশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পশুগুলি তাহাকে পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া শাস্তি প্রদান করিতে থাকিবে। এই হাদীসখানা সহীহ হাদীছের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ধনীদের প্রতি যাকাতের নিয়মাবলী শিক্ষা করা ফরয।

যাকাতের শ্রেণী-বিভাগ ও শর্ত ঃ ছয় প্রকার ধনের উপর যাকাত ফরয। (১) গৃহপালিত পশুর যাকাত। ইহার মধ্যে উট, গরু ও ছাগলের যাকাত দিতে হয়। অন্যান্য গৃহপালিত পশু যেমন, অশ্ব, গর্দভ ইত্যাদির যাকাত দিতে হয় না। চারিটি শর্ত পূর্ণ হইলে গৃহপালিত পশুর যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হয়। যথা—(ক) গৃহপালিত না হইয়া চারণভূমিতে প্রতিপালিত হওয়া যেন প্রতিপালন খরচ অধিক না হয়। সারা বৎসর পশুগুলিকে গৃহে প্রতিপালন করিলে যদি যাকাত পরিমাণ খরচ হয় তবে যাকাতের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। (খ) পূর্ণ এক বৎসর অধিকারে থাকা। কারণ, বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অধিকারচ্যুত হইলে যাকাত লাগে না। কিন্তু বৎসরের শেষাংশেও কোন পশুর বাচ্চা হইলে ইহাও হিসাবে ধরিয়া যাকাত দিতে হইবে। (গ) ধনী বলিয়া গণ্য হওয়া এবং ধনের উপর অবাধ ক্ষমতা থাকা। মাল কমিয়া গেলে বা কোন অত্যাচারী ব্যক্তি ছিনাইয়া লইয়া গেলে যাকাত দিতে হইবে না। কিন্তু হারানো পশু প্রভৃতি মাল পুনরায় লাভসহ পাওয়া গেলে অতীতকালের জন্যও যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হইবে। কাহারও যে পরিমাণ মাল অধিকারে আছে সেই পরিমাণ ঋণ

থাকিলে তাহার উপর যাকাত ওয়াযিব নহে। (ঘ) যে পরিমাণ মাল থাকিলে যাকাত ওয়াজিব হয় তাহা পূর্ণ থাকা। প্রত্যেক প্রকারের মালই নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকা আবশ্যক; তদপেক্ষা কম হইলে যাকাত ওয়াযিব হয় না।

(১) গৃহপালিত পশুর যাকাতের হিসাব ঃ শ্রেণীভেদে গৃহপালিত পশু নিম্নলিখিত পরিমাণে অধিকারে থাকিলে যাকাত ওয়াজিব হয়।

উটের যাকাত ঃ পাঁচটির কম হইলে উটের যাকাত ফরয হয় না। পাঁচটি উট থাকিলে একটি ছাগী, দশটি থাকিলে দুইটি ছাগী, পনরটি থাকিলে তিনটি ছাগী, বিশটি থাকিলে চারিটি ছাগী যাকাত দেওয়া ফরয। এই ছাগী পূর্ণ এক বৎসরের এবং ছাগ হইলে পূর্ণ দুই বৎসরের হইতে হইবে। বয়স ইহার কম হইলে চলিবে না। পঁচিশটি উট থাকিলে উহার যাকাত পূর্ণ এক বৎসরের একটি উটনী দেওয়া ফরয। উটনীর পরিবর্তে পূর্ণ দুই বৎসরের একটি উট দিলে চলিবে। উটের সংখ্যা ছয়ত্রিশ না হওয়া পর্যন্ত এই হিসাবে যাকাত দিতে হইবে; ছয়ত্রিশটি উট হইলে উহার যাকাত-স্বরূপ পূর্ণ দুই বৎসরের একটি উটনী দেওয়া ওয়াজিব। ছয়চল্লিশটি উটের জন্য তিন বৎসরের একটি উটনী, একষট্টিটি উট হইলে চারি বৎসরের একটি উটনী, ছিয়াত্তরটি উটের জন্য দুই বৎসরের দুইটি উটনী, একান্নব্বইটি উটের জন্য তিন বৎসরের দুইটি উটনী এবং একশত একুশটির জন্য দুই বৎসরের তিনটি উটনী যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। তৎপর প্রতি চল্লিশটি উটের জন্য দুই বৎসরের এবং প্রতি পঞ্চাশটির জন্য তিন বৎসরের একটি করিয়া উটনী যাকাত দিতে হইবে।

গরুর যাকাত ঃ গাভী হউক কি বলদ হউক, সংখ্যায় ত্রিশটি পূর্ণ না হইলে যাকাত ওয়াযিব হয় না। ত্রিশটি পূর্ণ হইলে এক বৎসরের একটি বাছুর এবং প্রতি চল্লিশটির জন্য দুই বৎসরের একটি বাছুর যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। ষাটটি পূর্ণ হইলে এক বৎসরের দুইটি বাছুর দিতে হইবে। মোটকথা, প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি এক বৎসরের এবং প্রতি চল্লিশটি গরুতে পূর্ণ দুই বৎসরের একটি বাছুর যাকাত দিতে হইবে।

ছাগলের যাকাত ঃ সংখ্যায় চল্লিশটি, পূর্ণ না হইলে ছাগলের যাকাত ওয়াযিব নহে। চল্লিশটি পূর্ণ হইলে একটি, একশত একুশটি হইলে দুইটি দুইশত একটি হইলে তিনটি এবং চারশত হইলে চারিটি ছাগল যাকাত দিতে হইবে। এই হিসাবে প্রতি একশতের জন্য একটি দিতে হইবে। ছাগী এক বৎসরের কম এবং ছাগল দুই বৎসরের কম হইলে চলিবে না। দুই ব্যক্তি নিজেদের ছাগল পরস্পর মিশাইয়া রাখিলে এবং তাহাদের কেহই কাফির বা ক্রয়-মূল্য প্রদানে মুক্তিদানে প্রতিশ্রুত ক্রীতদাস না হইলে উভয়ের মাল এক বলিয়া গণ্য হইবে। উভয়ের ছাগল একত্রে চল্লিশের অধিক